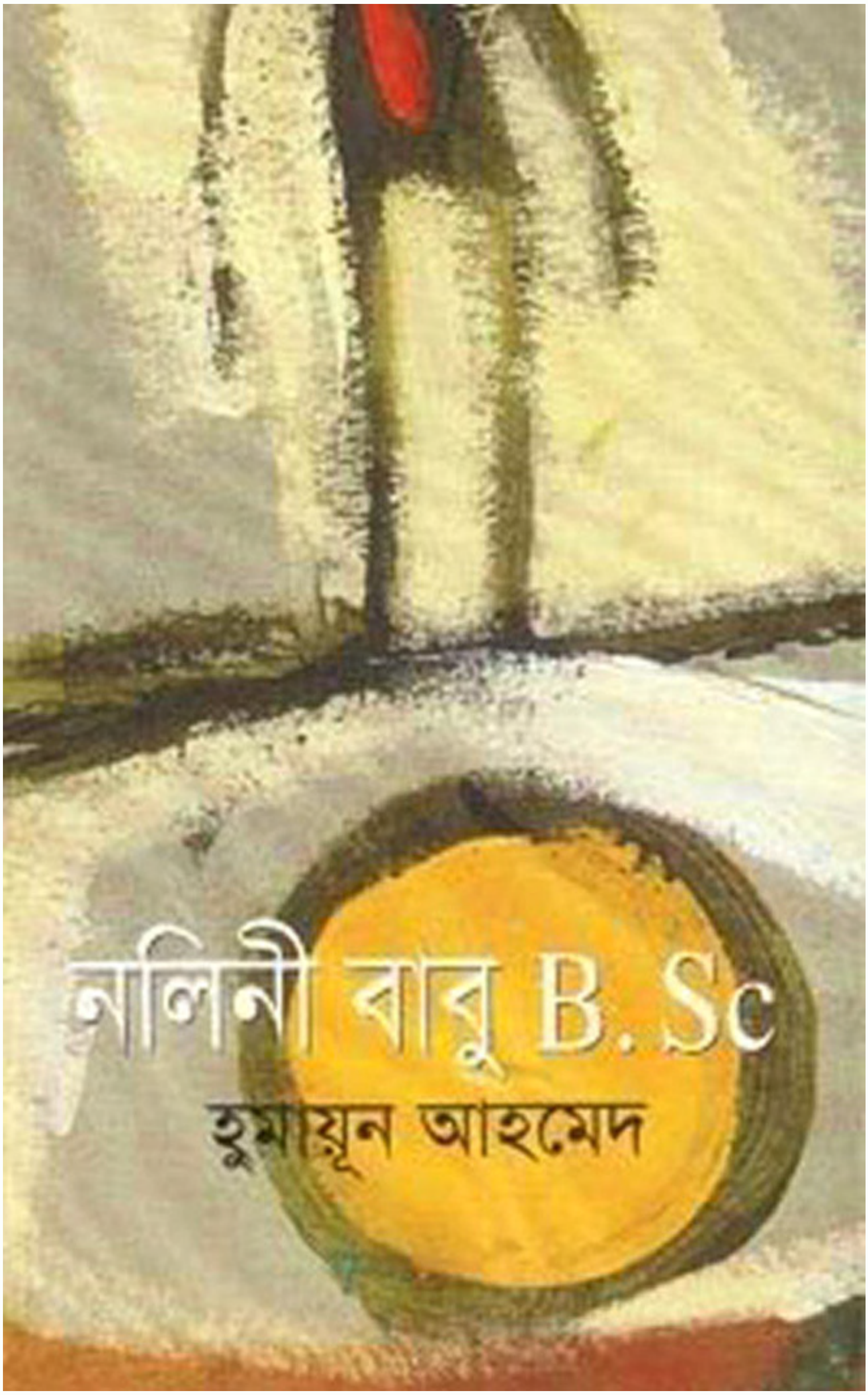
নলিনী বাবু B.Sc
হুমায়ূন আহমেদ

"কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ
কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ।
সংসারোহয় মতিব বিচিত্রঃ।।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতঃ।
তত্ত্বং চিন্তায় তদিদং ভ্রাতঃ।।"

কে তোমার স্ত্রী এবং কে তোমার পুত্র?
এই সংসারের ব্যাপার অতিশয় বিচিত্র।
তুমি কাহার এবং কোথা হইতেই বা আসিয়াছ,
হে ভ্রাতঃ! এই নিগূঢ় তত্ত্ব চিন্তা কর।

ভূমিকা

বিচিত্র বিষয় নিয়ে লিখতে আমার ভালো লাগে। সম্পর্কের গল্পের পাশাপাশি, সম্পর্কের বাইরের গল্প, ভূত-প্রেত, অশরীরী, ভিনগ্রহের মানুষ এইসব। আমাকে হাবিজাবি লেখক অবশ্যই বলা যেতে পারে।

নলিনী বাবু B.Sc.তে আমাদের অতি পরিচিত কাঠামোর মোড়কে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অদেখা ভুবনের গল্প বলতে চেয়েছি। সালভাদর দালি নিশি স্বপ্নকে ছবিতে নিয়ে এসেছেন, আমি চেষ্টা করেছি নিশি স্বপ্ন গদ্যে নিয়ে আসার। তবে এই রচনা অবশ্যই সুররিয়েলিস্টিক রচনা না। সুররিয়েলিস্টিক জগতের ছায়ায় রিয়েলিস্টিক রচনা।

আমি কি বলতে চেয়েছি তা কি বুঝাতে পেরেছি?

মনে হয় না।

যাই হোক, কি আর করা। চেষ্টা তো করেছি।

নলিনী বাবু B.Sc.র জগতে সবাইকে নিমন্ত্রণ।

হুমায়ূন আহমেদ
নুহাশ পল্লী, গাজীপুর
১ ফেব্রুয়ারি, ২০১০

'আমি নীলগঞ্জ গার্লস হাইস্কুলের বিএসসি শিক্ষক' বলেই ভদ্রলোক আমার পা ছোঁয়ার জন্য হাত বাড়ালেন। আমি খপ করে তার হাত ধরলাম। বয়স্ক একজন মানুষ, মাথার সব চুল ধবধবে সাদা। তিনি আমার পা স্পর্শ করবেন কেন? পা ছোঁয়াছুঁয়ির ব্যাপারটা এমনিতেই আমার অপছন্দ।

আমার নাম নলিনী ভট্টাচার্য।

আপনি বসুন। বিশেষ কোনো কাজে কি এসেছেন?

আজ্ঞে না। আমি লেখক দেখতে এসেছি।

আমি হাসতে হাসতে বললাম, ভালো করে লেখক দেখুন। আমিও আপনাকে দেখি।

ভদ্রলোকের বয়স ষাটের কাছাকাছি। বেঁটেখাটো মানুষ। বড় বড় চোখ। চোখের মণিতে বিস্ময়বোধ। ব্রাহ্মণরা বেশিরভাগ সময় গৌরবর্ণের হন। ইনার গায়ের রঙ কালো। ভদ্রলোকের বিশেষত্ব হচ্ছে, তিনি পাঞ্জাবির সঙ্গে ধুতি পরেছেন। বাংলাদেশের হিন্দু সম্প্রদায় ধুতি ছেড়ে দিয়েছে। দুর্গাপূজার সময় কিছু ধুতি পরা মানুষ দেখা যায়। ধুতি নিয়ে তাদের খানিকটা সংকোচিত এবং বিব্রতও মনে হয়।

নলিনী ভট্টাচার্যের পোশাকের আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে, তিনি ধুতির সঙ্গে জুতা-মোজা পরেছেন। জুতা জোড়া বেশ ভারী এবং ধুতির সঙ্গে যাচ্ছে না।

আপনি কি সবসময় জুতা পরেন?

পরি।

অস্বস্তি লাগে না?

নলিনী বাবু বিস্মিত হয়ে বললেন, অস্বস্তি লাগবে কেন?

আমি বললাম, আপনি ব্রাহ্মণ মানুষ। গরুর প্রতি ভক্তি আপনাদের মজ্জাগত। গরুকে দেবতার মতো দেখা হয়। দেবতার চামড়ায় বানানো জুতা পরতে অস্বস্তি লাগার কথা।

নলিনী বাবু বিব্রত গলায় বললেন, আপনি এই কথা প্রথম বললেন। আমি এর আগে ব্যাপারটা নিয়ে ভাবিনি। বাকি জীবন আমি আর জুতা পরব না। আপনাকে, কথা দিচ্ছি।

ভাই আমি কথার কথা বলেছি।

আপনি সত্য ভাষণ করেছেন।

ভদ্রলোকের বিব্রত ভাব দেখে নিজেই লজ্জা পেলাম। মানুষকে বিব্রত করা আমার স্বভাবের মধ্যে নেই। তারপরও এ ধরনের কাজ আমি প্রায়ই করি। অপরিচিত মানুষ, যারা প্রথমবার আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, তাদের সঙ্গেই বেশি করি। মাসখানেক আগে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ছাত্র এসেছিল। সে কিছু কবিতা লিখেছে, আমাকে দেখাতে এসেছে। আমি বললাম, আমি গদ্য লেখক, কবিতা বুঝি না।

সে বিনয়ী গলায় বলল, না বুঝলেও পড়ে দেখুন।

আমি বললাম, তোমার নাম কী?

সে বলল, যূপকাষ্ঠ।

ছদ্মনাম?

জি স্যার।

ছদ্মনাম কেন?

কবি হিসেবে আসল নামটা যায় না।

আসল নাম কী?

আহম্মদ মিখাইল। ফেরেশতা মিখাইল (আঃ) এর নামে নাম।

আমি বললাম, যূপকাষ্ঠের চেয়ে আহম্মদ মিখাইল নাম অনেক সুন্দর। তারপরও ফেরেশতার নামের সঙ্গে মিলিয়ে মানুষের নাম হওয়া ঠিক না।

কেন স্যার?

মানব সম্প্রদায়ের অবস্থান ফেরেশতাদের অনেক উপরে। ফেরেশতাদের যে প্রধান তাকে বলা হয়েছিল মানুষকে কুর্নিশ করতে। জানো না?

জানি স্যার।

শোনো যূপকাষ্ঠ বাবু, তুমি বিদায় হও।

ছেলেটা লজ্জা পেয়ে চলে যাওয়ার পর মনটা খুবই খারাপ হলো। এই ব্যবহারটা না করলেও হতো। কেন এ রকম করি?

লেখক হিসেবে আমার মধ্যে কি অহঙ্কার দানা বাঁধতে শুরু করেছে? না-কি পুঁটি মাছ হয়ে যাচ্ছি?

প্রকাণ্ড রুই মাছ গভীর পানিতে বাস করে। চলনে ধীরস্থির। পুঁটি মাছ গণ্ডুষ পানিতেও ফরফর করে। সংস্কৃতে বলে ফরফরায়তে—

গণ্ডুষ জল মাত্রেন
সফরি ফরফরায়তে।

যা-ই হোক, নলিনী বাবুর কাছে ফিরে যাই। তিনি পকেট থেকে পানের ছোট্ট বাহারি কৌটা বের করে পান মুখে দিয়েছেন। জর্দার গন্ধ আসছে। আঙ্গুলের ডগায় চুন নিয়ে বসে আছেন। মনে হচ্ছে ভদ্রলোক পানবিলাসী। আমি বললাম, আপনার লেখক দেখা শেষ হয়েছে?

তিনি জবাব দিলেন না। সুন্দর করে হাসলেন। আমি বললাম, আপনি আমার কয়টা বই পড়েছেন?

তিনি বললেন, একটা। আমি কোনো লেখকের একটার বেশি বই পড়ি না। আপনার পড়েছি 'মিসির আলি'। শরৎবাবুর 'চরিত্রহীন', যাযাবরের 'দৃষ্টিপাত'। রবিবাবুর নৌকাডুবি পড়া শুরু করেছিলাম, একত্রিশ পৃষ্ঠা পড়ার পর বইটা চুরি হয়ে গেল। বাকিটা পড়া হয় নাই।

আমি বললাম, সব লেখকের একটা করে বই পড়েন কেন?

তিনি বললেন, হাঁড়ির ভাত সিদ্ধ হয়েছে কি না জানার জন্য সব ভাত টিপতে হয় না। একটা ভাত টিপলেই হয়।

আমার ভাত কি সিদ্ধ হয়েছে?

নলিনী বাবু জবাব দিলেন না। তবে তার ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো আমার ভাত সিদ্ধ হয়নি। চক্ষুলজ্জায় বলতে পারছেন না। আমি বললাম, ভাই আমার একটু কাজ আছে। আপনি আরেক দিন আসুন, তখন কথা হবে।

নলিনী বাবু বললেন, আপনি ভদ্রভাবে আমাকে বিদায় করতে চাচ্ছেন সেটা বুঝতে পারছি। একটা ছোট্ট রসিকতা করে চলে যাব। আগে না শুনে থাকলে মজা পাবেন। অঙ্কের ক্লাসে ছাত্রদের বিনোদন দেওয়ার জন্য মাঝে মাঝে রসিকতা করি। তারা হো হো করে হাসে। খুবই মজা লাগে। একটা বলব?

বলুন।

এক লোক জীবনে প্রথম ফুটবল খেলা দেখতে গিয়েছে। সে পাশের জনকে জিজ্ঞেস করল, বলটা নিয়ে ওরা কী করছে? পাশের জন বলল, গোল করার চেষ্টা করছে। সে বিস্মিত হয়ে বলল, বলটা তো গোলই আছে। আর কিভাবে গোল করবে? ||মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক||

নলিনী বাবু গল্প শেষ করে বললেন, জোকটা বেশ হাসির, যে শুনে সেই হাসে কিন্তু আপনি হাসেননি। আগে শুনেছেন ?

আমি বললাম, আগে শুনিনি। বিরক্ত মানুষ হাসে না। মনে হয় আমি বিরক্ত।

আমার উপর বিরক্ত ?

আপনি ছাড়া তো আর কেউ নেই যে তার উপর বিরক্ত হব।

মানুষ অনেক সময় নিজের উপরেও বিরক্ত হয়।

আমি নিজের উপর না, আপনার উপর বিরক্ত। এই সময় আমি লেখালেখি করি। আপনার কথায় ভাত হাঁড়িতে সিদ্ধ করি। ভাত সিদ্ধ করার কাজে বাধা পড়লে বিরক্ত হই।

নলিনী বাবু বললেন, আপনার জন্য কিছু মাছ এনেছিলাম। ঘরে ঢুকাইনি। বারান্দায় রেখেছি। গৃহিনীকে মাছগুলো দিয়ে চলে যেতাম।

আমি বললাম, স্ত্রীর সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। আমি এখন একা বাস করছি।

ছাড়াছাড়ি হবার কারনটা কি জানতে পারি ?

আমি বিরক্ত গলায় বললাম, না।

এতবড় বাড়িতে একা থাকেন ?

হ্যাঁ।

নিজের বাড়ি, নাকি ভাড়া ?

ভাড়া (তখন উত্তরায় এক বাড়ি ভাড়া করে থাকি)।

ভাড়া কত দেন ?

কুড়ি হাজার টাকা।

ইলেকট্রিসিটি, পানির বিল সব কি এর মধ্যে ?

না, ইউটিলিটি আলাদা।

আপনার পাচক ছেলেটিকে ডাকুন তাকে মাছগুলো বুঝিয়ে দেই। পদ্মার দুটি ইলিশ আছে, মিঠাপানির গলদা চিংড়ি আছে। টেংরা আছে। সবই আমি নিজে দেখেশুনে কিনেছি। কোনটা কিভাবে রাঁধতে হবে পাচককে বুঝিয়ে বলে দেই।

আমি হতাশ গলায় বললাম, আমি এই বাড়িতে নতুন উঠেছি। আমার কোনো পাচক বা কাজের ছেলে এখনও জোগার হয়নি।

আপনি খাওয়া-দাওয়া করেন কোথায় ?

একটা হোটেলের সঙ্গে ব্যবস্থা করা আছে, ওরা দু'বেলা খাবার দিয়ে যায়।

নলিনী বাবু বললেন, মাছগুলো ফ্রিজে রেখে যাই। তবে টাটকা খাওয়া আর ফ্রিজের বাসি খাওয়া আকাশ-পাতাল ফারাক হবে।

আমি বললাম, ফ্রিজ এ বাড়িতে নেই। তাই কিছু মনে করবেন না। আপনার পেছনে আমি অনেক সময় নষ্ট করেছি। আর করব না। মাছগুলো নিয়ে আপনি চলে যান।

নলিনী বাবু উঠে দাঁড়ালেন এবং আবার বসে পড়তে পড়তে বললেন, আপনার জন্য মাছ কিনেছি। আমি কীভাবে নিয়ে যাব? আপনার যে বইটা পড়েছি সেখানে লেখা ধোপখোলার বাজারের পদ্মার ইলিশ, মিঠাপানির গলদা চিংড়ি আর টেংরা মাছের কথা। আমি ধোপখোলার বাজার থেকেই মাছগুলো কিনেছি। আমি বিত্তবান কেউ না। সামান্য শিক্ষক। মাছ কিনতে আমার অর্থ ব্যয় হয়েছে। আপনি লেখক মানুষ। আপনার বোঝার কথা।

আমি কী বলব বুঝতে পারলাম না। ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করাটাই বোকামি হয়েছে। গেটে দারোয়ানকে দিয়ে বলে পাঠালেই হতো, আমি অসুস্থ, কারও সঙ্গে দেখা করছি না।

নলিনী বাবু বললেন, আমি আপনাকে একটা ভালো প্রস্তাব দিচ্ছি। ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করুন। মাছ আমি রেঁধে দিয়ে যাই। আমি একজন ভালো পাচক। বিবাহ করিনি। নিজের রান্না নিজেকেই করতে হয়। গাইতে গাইতে যেমন গায়েন, রাঁধতে রাঁধতে রাঁধুনি।

আমি বললাম, রান্না কিভাবে করবেন? মসলাপাতি কিছুই নেই। হাঁড়ি-পাতিলও নেই।

নলিনী বাবু বললেন, যা যা প্রয়োজন আমি সবই সংগ্রহ করব। আপনি শুধু অনুমতি দিন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের সামান্য আবদার।

আমি যতটুকু বিরক্ত হওয়া সম্ভব ততটুকু বিরক্ত হয়েই লেখার টেবিলে বসলাম। 'রূপার পালংক' নামে একটা উপন্যাসের শেষ কয়েকটি পাতা আজই শেষ করার কথা। প্রকাশককে সন্ধ্যাবেলায় আসতে বলেছি। এখন মনে হচ্ছে শেষ করতে পারব না। তারপরও লেখার টেবিলে কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। তখন নলিনী বাবু উঁকি দিলেন।

কোন চাল আপনার পছন্দ? নাজিরশাল আনব, নাকি মিনিকেট?

আমি বললাম, যা ইচ্ছা আনুন, তবে টাকা দিচ্ছি নিয়ে যান। নিজের পকেট থেকে একটা পয়সাও খরচ করবেন না। গ্যারাজে গাড়ি আছে। গাড়ি নিয়ে যান। ড্রাইভারের নাম আলি হোসেন।

আপনার গাড়ি আছে?

হ্যাঁ আছে।

বলেন কী?

এত বিস্মিত হচ্ছেন কেন? ঢাকা শহরের চল্লিশ ভাগ মানুষের গাড়ি আছে।

গাড়ি কত দিয়ে খরিদ করেছেন?

মনে নাই। ভাই এখন যান তো, আর বিরক্ত করবেন না।

ঘড়ি দেখলাম। একটা বাজে। কখন বাজার আসবে, কখন রান্না হবে কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি বাইপাসের রোগী। দুপুরে যথাসময়ে খাওয়া-দাওয়া করে আমাকে কিছুক্ষণের জন্য হলেও ঘর অন্ধকার করে শুয়ে থাকতে হয়। ব্যাধির কারণে জীবনে খানিকটা যান্ত্রিকতা চলে এসেছে। আজ মনে হয় সমস্ত রুটিন এলোমেলো হবে।

আমি দেড়টা পর্যন্ত লেখালেখি করলাম। ঠিক দেড়টায় টিফিন ক্যারিয়ারে করে হোটেল থেকে খাবার চলে এলো। খেয়ে শোবার ঘরে দরজা-জানালা বন্ধ করে শুয়ে পড়লাম। সদর দরজা খোলা থাকল যাতে নলিনী বাবু ঘরে ঢুকতে পারেন।

দুপুরের ঘুম আমার কখনোই ভালো হয় না। আজ কিছুক্ষণের মধ্যেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম। এই জাতীয় ঘুমের একটা নাম আছে– মরণ ঘুম। অতলে তলিয়ে যাওয়া। ঘুম ভাঙল সন্ধ্যা পার করে, ঝুম বৃষ্টির শব্দে। এবারের আষাঢ় মাসে বৃষ্টি হয়নি বললেই চলে। আজ ঢাকা শহর ভাসিয়ে বৃষ্টি নেমেছে। অনেক দিন পর বর্ষাযাপন করার মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বর্ষাযাপন একা করা যায় না। অতিপ্রিয় কাউকে পাশে লাগে। এই মুহূর্তে আমার অতিপ্রিয় কেউ নেই। অতি বিরক্তিকর মানুষ অবশ্যি এই মুহূর্তে একজন আছেন, নলিনী বাবু। রান্নাঘর থেকে তার খুটখাট শব্দ শুনতে পাচ্ছি। মনে হয় রান্না শুরু হয়েছে। মশলা বাটার আওয়াজ আসছে। কি আশ্চর্য, ভদ্রলোক মশলা বাটছেন নাকি?

ঝুম বৃষ্টির সময় আমি অবধারিতভাবে রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান শুনি। আজ তা সম্ভব হচ্ছে না। ঘরে গান শোনার যন্ত্রপাতি নেই। অভ্যস্ত পারিবারিক জীবন থেকে ছিটকে পড়েছি। এখনো গুছিয়ে উঠতে পারিনি। গুছাতে পারব বলেও মনে হচ্ছে না।

ইলেকট্রিসিটি চলে গেছে। নলিনী বাবু একটা জ্বলন্ত মোমবাতি নিয়ে ঢুকলেন। ঘরে মোমবাতি থাকার কথা না। মনে হয় তিনিই কিনে এনেছেন।

নলিনী বাবু বললেন, বাজার করতে দেরি হয়েছে। পছন্দের জিনিস কিছুই পাইনি। ভালো শিলপাটা কেনার জন্য যেতে হয়েছে পুরান ঢাকায়। হার্ডওয়্যারের দোকানে যা পাওয়া যায় সবই বেলেপাথরের। তবে খুঁজে পেতে যেটা পেয়েছি, সেটা অসাধারণ। একশ' বছর টেকার জিনিস।

আমি বললাম, আমরা কেউ থাকব না। শিলপাটা একশ' বছর টিকে থাকবে, তাতে লাভ কি?

আপনার পরের বংশধররা ব্যবহার করবে। প্যাকেটের মসলার সঙ্গে বাটা মসলার তফাৎটা শুধু তাদের ধরিয়ে দিতে হবে।

মসলা কি আপনি বাটবেন?

হুঁ।

আপনার ফ্রেশ মাছ নষ্ট হয়ে যায়নি?

আজ্ঞে না। মাছগুলো আপনার নিচতলার ফ্ল্যাটের ভদ্রমহিলার ফ্রিজে রেখে গিয়েছিলাম। বিনিময়ে তাকে একটি ইলিশ মাছ আর তিনটি গলদা চিংড়ি দিয়েছি।

তিনি রেখেছেন?

হ্যাঁ, রেখেছেন। খুশি হয়েই রেখেছেন। ফ্রেশ মাছের মর্যাদা গৃহিণীদের মতো কেউ বোঝে না। স্যার কি চা খাবেন? এক কাপ চা করে দেব?

দিন।

রাত নয়টার মধ্যে খাওয়া তৈরি হয়ে যাবে। ন'টা পর্যন্ত কষ্ট করে ক্ষুধা সহ্য করতে হবে।

ঠিক আছে। সহ্য করব।

আপনি বদ্ধঘরে বসে না থেকে বারান্দার চেয়ারে বসে বৃষ্টি দেখুন। আপনারা লেখক মানুষ, বৃষ্টি, ঝড় এসবই তো আপনাদের পছন্দ। শরৎবাবু আরাম কেদারায় শুয়ে বৃষ্টি দেখতেন। আপনার এই বাসায় কোনো আরাম কেদারা দেখলাম না। আমাদের নীলগঞ্জে হাকিম নামে খুব ভালো একজন কাঠমিস্ত্রি আছে। তাকে দিয়ে আমি আপনার জন্য একটা আরাম কেদারা বানিয়ে দেব। চা কি দুধ চা হবে, না লেবু চা? দুধ, লেবু সবই নিয়ে এসেছি। একটা জিনিস শুধু পাইনি, পোস্তদানা। পোস্তদানা দিয়ে গলদা চিংড়ি রান্নার শখ ছিল। দেখি পরের বার।

আমি দীর্ঘ নিশ্বাস চাপার চেষ্টা করলাম। এই দিন দিন নয়, আরও দিন আছে। নলিনী বাবু আবারও আসবেন।

রাতে খেতে বসলাম। নলিনী বাবু আমার সামনে আসনপিঁড়ি হয়ে বসে পান চিবুতে লাগলেন। তিনি একাহারি। সকাল এগারোটার দিকে একবার খান। সারাদিন পান ছাড়া কিছু খান না। রাতে এক কাপ দুধ খেয়ে ঘুমুতে যান।

দিনের পর দিন হোটেল-রেস্টুরেন্টে খাচ্ছি। খাওয়া ব্যাপারটার ওপরই অভক্তি উঠে গিয়েছিল। অনেক দিন পর যা মুখে দিচ্ছি অমৃতের মতো লাগছে। নলিনী বাবু বললেন, পৃথিবীতে তিন ধরনের খাবার আছে–

রাজসিক

তামসিক

সাত্ত্বিক

রাজা-মহারাজারা যেসব খাবার খান সেটা রাজসিক। ভোগী মানুষের খাবার হলো তামসিক। মাংসপ্রধান খাবার, সঙ্গে অনুপান হিসেবে মদ্য। আপনি যে খাবার খাচ্ছেন তা হলো সাত্ত্বিক। শুদ্ধ খাবার। সাধু পুরুষরা খান।

আমি যতদূর জানি সাত্ত্বিক খাবার হয় নিরামিষ। মাছ সেখানে থাকার কথা না।

নলিনী বাবু জিভে কামড় দিয়ে বললেন, আপনার কথা ঠিক। আপনি লেখক মানুষ। আপনি তো জানবেনই। অপরাধ ক্ষমা করবেন।

আমি বললাম, আপনি সব লেখকদের একটা করে বই পড়েছেন, বিভূতিভূষণের কোনো বই পড়েছেন?

'দৃষ্টি প্রদীপ' পড়েছি।

উনার একটা উপন্যাসের নাম 'আদর্শ হিন্দু হোটেল'। সেই হোটেলে তিনি একজন রন্ধনশিল্পীর গল্প বলেছেন। আপনার উচিত স্কুলের মেয়েদের অঙ্ক না শিখিয়ে একটা হোটেল দেয়া।

নলিনী বাবু বললেন, আমি এক-দুইজনের জন্য রাঁধতে পারি। বেশি মানুষের জন্য পারি না।

খাওয়া শেষ করে একটা পান মুখে দিলাম। সিগারেট ধরালাম। বৃষ্টি তখনও পড়ছে। ভালোভাবেই পড়ছে। আমি বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে বৃষ্টি দেখছি। নলিনী বাবু আমার পাশের চেয়ারে বেশ আরাম করে পা তুলে বসেছেন। আমি বললাম, ভাই আপনার অসাধারণ খাবার খেয়ে তৃপ্তি পেয়েছি। মানুষ বাঁচার জন্য খায়। এখন মনে হচ্ছে শুধুমাত্র খাওয়ার জন্য বেঁচে থাকাটাও খারাপ না।

নলিনী বাবু হাসলেন। তার হাসি সুন্দর। বেশিরভাগ মানুষ শুধু ঠোঁট দিয়ে হাসে। কেউ কেউ ঠোঁটের সঙ্গে চোখ ব্যবহার করে। এদের হাসি দেখাতে ভালো লাগে। নলিনী বাবু দ্বিতীয় দলের।

আমি বললাম, আপনি নিশ্চয়ই কোনো বিশেষ কারণে আমার কাছে এসেছেন। কারণটা বলুন।

তেমন কোনো কারণ নেই, একজন জ্ঞানী মানুষের সঙ্গে কিছুক্ষণ সময় কাটানো।

আমি জ্ঞানী মানুষ আপনাকে কে বলল?

আপনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। বিজ্ঞানের কঠিন বিষয় পড়ান। আপনি জ্ঞানী তো বটেই। এ ছাড়াও অন্য কারণ আছে। মিসির আলির যে বইটা আমি পড়েছি তার সঙ্গে আমার জীবনের খুব মিল আছে। মিলের ব্যাপারটা বলার শখ ছিল।

বইটার নাম কী?

নিষাদ। কাহিনী কি আপনার মন আছে, না ভুলে গেছেন?

মনে আছে। আপনার কাহিনী কী?

বলা শুরু করব?

হ্যাঁ, শুরু করুন।

বিরক্ত হবেন না তো?

বিরক্ত তো হবই। লেখকরা নিজেরা গল্প তৈরি করেন। অন্যদের গল্প শুনে আনন্দ পান না।

বৃষ্টির ছাট আসছে। আপনি এখানেই বসবেন নাকি ভেতরে যাবেন?

এখানেই বসব।

নলিনী বাবু গল্প শুরু করলেন।

গম্ভীর গলায় বললেন, 'আমি এই জগতের অতি দুঃখী মানুষদের একজন। আবার অতি সুখী মানুষদেরও একজন।'

আমি বললাম, আপনার গল্পের শুরুটা ভালো। আপনি একনাগাড়ে বলে যান। আমি আপনাকে মাঝখানে থামাব না। 'হুঁ' দেব না। 'তারপর কী হলো' বলব না, আপনি কথা বলে যাবেন নিজের মতো।

ধন্যবাদ।

গল্প শুরু করার আগে সামান্য বেয়াদবি করব। নিষাদ বইটি নামকরণের কোনো সার্থকতা আমি খুঁজে পাইনি।

সব কিছুর সার্থকতা খোঁজার প্রয়োজন কি আছে?

আছে। নিষাদ নাম শ্লোকে প্রথম ব্যবহার করেন বাল্মীকি।

মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং তমগমঃ শাশ্বতীঃ খমাঃ।
যৎ ক্রৌনৎঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতম্ ॥

এর অর্থ নিষাদ, তুই চিরকাল প্রতিষ্ঠা লাভ করবি না, কারণ তুই ক্রৌঞ্চ মিথুনের একটিকে কামমোহিত অবস্থায় বধ করেছিস।

রামায়ণের গল্প থাকুক। নিজের গল্প শুরু করুন।

নলিনী বাবু গল্প শুরু করলেন।

আমার বাবার নাম শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য।

তিনি ময়মনসিংহ জজকোর্টের পেশকার ছিলেন। অসৎ উপায়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছেন। একজন পুরুষ মানুষের যত রকম খারাপ অভ্যাস থাকা সম্ভব সবই তার ছিল। মদ-গাঁজা খেতেন, আফিম খেতেন। ললিতা নামে অল্প বয়সী এক মেয়েকে রক্ষিতা হিসেবে রেখেছিলেন। মাসে একবার খারাপ পাড়ায় যেতেন রুচি বদলাবার জন্যে। ললিতা ছাড়া দশ-এগারো বছরের একটি বালকও তার সঙ্গে থাকত। তাঁর হাত-পা টিপে দিত। বালকের নাম সুরুজ। এই বালকের সঙ্গেও তাঁর শারীরিক সম্পর্ক ছিল। আমি কি বাবার বিষয়ে সম্পূর্ণ চিত্র আপনাকে দিতে পেরেছি?

পেরেছেন।

একটি সংস্কৃত শ্লোক বাবার চরিত্র পুরোপুরি ব্যাখ্যা করে। যদি অনুমতি দেন শ্লোকটি বলি?

বলুন।

যথা নিযুক্তোহস্মি তথা করোমি জানামি
ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তি।
জানাম্যধমং ন চ মে নিবৃত্তিঃ ॥

এর অর্থ ধর্ম কি তা আমি জানি, কিন্তু তাহাতে আমার প্রবৃত্তি হয় না। অধর্ম কি তাহাও আমি জানি, তাহা হইতে আমি নিবৃত্ত হইতে পারি না।

শ্লোকটা সুন্দর, আমাকে লিখে দিয়ে যাবেন।

অবশ্যই লিখে দিয়ে যাব। আমি সুন্দর সুন্দর শ্লোক জানি, একটা বড় খাতায় সব লিখে দিয়ে যাব। আপনি প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারবেন। এখন বাবার চেহারার বর্ণনা দেব? আপনি লেখক মানুষ। লেখকদের কাছে চেহারার বর্ণনা গুরুত্বপূর্ণ।

চেহারার বর্ণনা দিন।

সুন্দরের বর্ণনায় আমরা রাজপুত্র শব্দটি ব্যবহার করি। বাবা ছিলেন রাজপুত্রদের রাজপুত্র। গাত্রবর্ণ গৌর। মাথা ভর্তি কুঁড়ানো চুল। বড় বড় চোখ। বাল্মীকি রামের শরীরের যে বর্ণনা দিয়েছেন বাবার সঙ্গে তার মিল আছে।– "তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুষম ও সুবিন্যস্ত, বর্ণ স্নিগ্ধ, তিনি আয়াত নেত্র, লক্ষ্মীবান ও শুভ লক্ষণযুক্ত।"

ইন্টারেস্টিং।

বাবা ময়মনসিংহ শহরে থাকতেন। মাসের প্রথম বৃহস্পতিবার রাতে নীলগঞ্জ আসতেন। ললিতা মেয়েটাকে নিয়ে আসতেন। দু'দিন থেকে রোববার ভোরে চলে যেতেন। এই দু'দিন আমি এবং মা আতঙ্কে অস্থির হয়ে থাকতাম।

আমার মায়ের নাম বুকুল বালা। সাধারণত দেখা যায় স্বামী রূপবান হলে স্ত্রী রূপবতী হন না। মা'র ক্ষেত্রে ঘটনা তা হয়নি। আমার মা'র মতো রূপবতী সচরাচর দেখা যায় না।

বাবা-মা পাশাপাশি দাঁড়ালে মনে হতো রাজপুত্র-রাজকন্যা। তবে মায়ের গাত্রবর্ণ ছিল শ্যামলা। আমি মায়ের গাত্রবর্ণ পেয়েছি। মা ছিলেন স্বল্পভাষী তরুণী। তার প্রধান শখ গল্পের বই পড়তে পড়তে চোখের পানি ফেলা। বিয়ের সময় তিনি ট্রাংক ভর্তি করে বই নিয়ে এসেছিলেন। আমি যে বিভিন্ন লেখকের একটা একটা করে বই পড়েছি, মার কাছ থেকে নিয়ে পড়েছি। শুধু আপনার বইটা পড়েছি অনেক পরে। আমাদের স্কুলের এক ছাত্রীর কাছ থেকে ধার করে পড়েছি। ছাত্রীর নাম সুলতানা বেগম। দশম শ্রেণী, বিজ্ঞান শাখা। রোল দুই। অতি ভালো মেয়ে।

যে কথা বলছিলাম, দু'দিনের জন্য এসে বাবা গজব করে ফেলতেন। মা বাবাকে ভয় পেতেন যমের মতো। প্রায়ই দেখেছি, মা বাবার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, কোনো কারণ ছাড়াই ভয়ে থরথর করে কাঁপছেন। বাবা হয়তো বললেন, বকুল বালা ভালো আছ?

মা'র মুখে কথা আটকে যেত। 'ভালো আছি' বলতেও তাঁর অনেক সময় লাগত।

ললিতা মেয়েটা দুটি দিন খুবই আনন্দে কাটাতো। কুয়াতলাটা তার পছন্দের জায়গা ছিল। বেশিরভাগ সময় সে কুয়াতলায় বসে পায়ে আলতা দিত। চুল আঁচড়াত। মাথায় তেল দিত। তার মুখ থাকত হাসি হাসি। আমার সঙ্গে তার টুকটাক কথাও হতো। ছিপ ফেলে মাছ মারায় তার শখ ছিল। তার জন্য ছিপ, মাছের আধার কেঁচো জোগাড় করে রাখতে হতো। মাছ মারা হতো আমাদের পুকুরেই। বাবা তার অসৎ পয়সায় নীলগঞ্জে

দোতলা দালান করেছেন। বাড়ির পেছনে বিশাল পুকুর কাটিয়েছেন। ঘাট বাঁধিয়েছেন।

মাছ মারার সময় ললিতার সঙ্গে আমাকে থাকতে হতো। আমার মা চাইতেন না আমি ললিতার সঙ্গে মিশি। আমি মা'র কাছে ভাব করতাম ললিতাকে পছন্দ করি না। সে ডাকলে যেতে চাই না। শুধু বাবার ভয়ে না করতে পারছি না। পুকুরে ছিপ ফেলে ললিতা নানা গল্প নিজের মনেই করত। যেমন একদিন বলল, টাকি মাছের জন্ম কি জন্য হয়েছে জানিস?

আমি বললাম, না।

টাকি মাছের জন্ম হয়েছে ভর্তা হওয়ার জন্য। টাকি মাছের ঝোল, ভাজি কেউ খায় না। সবাই ভর্তা খায়। মানুষের মধ্যেও মাছস্বভাব আছে। কিছু মানুষ আছে টাকি মাছ, যেমন– তোর মা। জন্ম হয়েছে ভর্তা হওয়ার জন্য।

আমি বললাম, তুমি কি মাছ?

আমি হইলাম তিতপুঁটি। শরীরে লাল দাগ আছে। আসলে পুঁটি। তিতা বলে তিতপুঁটি।

আর আমার বাবা কি মাছ?

বাইম মাছ। কাদার ভেতরে থাকে, কাদার ভিতর বড় হয়। দেখতে সাপের মতো। বাইম মাছ নিজের ডিম নিজে খায় এটা জানিস?

না।

তাহলে জানিস কি? তুই তো গাধা। শিল্লুক দিলে ভাঙানি দিতে পারবি?

জানি না।

চেষ্টা করে দেখ পারিস কি না। বল দেখি–

"সুতার আগায় ঝুলি
মিষ্টি কথায় ভুলি
আয় আমারে ধর
ফাঁস নিয়া মর।"

বল এটা কি?

জানি না।

তুই তো গাধারও নিচে। এটা হইল বড়শি।

ললিতা মেয়েটাকে আমি পছন্দ করতাম। তবে তার কাছেও ভাব দেখাতাম পছন্দ করি না। দূরে দূরে থাকতাম। লক্ষ্য থাকত তার দিকে। সে যখন হাত ইশারায় ডাকত তখন এমন ভাব করতাম যেন অনিচ্ছার সঙ্গে যাচ্ছি।

আমার বয়স তখন কত? নয় কিংবা দশ। পড়ি ক্লাস ফাইভে। মার সঙ্গে সুখেই থাকি। বাবার অনুপস্থিতিতে বাড়িটা আমাদের দু'জনার। প্রতিদিন দুপুরে মার সঙ্গে দীঘিতে সাঁতার কাটি। বাড়ির ছাদে ওঠার জন্য লোহার একটা প্যাঁচানো সিঁড়ি আছে। প্রয়োজন ছাড়া ছাদে ওঠা সম্পূর্ণ নিষেধ ছিল। বাবার নিষেধ। কারণ ছাদে রেলিং নেই। বাবা লোহার সিঁড়ির মাথায় দরজা লাগিয়ে তালাবদ্ধ করে দিয়েছিলেন। তালার চাবি থাকত তার কাছে। মা গোপনে আলাদা চাবি বানিয়ে নিয়েছিলেন। আমরা প্রায় রাতেই তালা খুলে ছাদে উঠতাম।

নিষিদ্ধ একটা কাজ করছি– এই উত্তেজনায় দু'জনই অস্থির হয়ে থাকতাম। মনে মনে বলতাম, বাবা যেন আর এ বাড়িতে না আসে। বাকি জীবনটা আমি এবং মা পরম সুখে পার করে দেব।

ললিতার উপস্থিতিতে মাতা-পুত্রের আনন্দময় জীবন বাধা পড়ত। আমরা দু'জন আলাদা হয়ে পড়তাম।

সন্ধ্যাবেলা ললিতা বাবার কাছ থেকে চাবি নিয়ে ছাদের দরজা খুলত। আমাকে নিয়ে ছাদে যেত। আমাকে বলত আমার কোলে মাথা রাখ আমি উকুন বাইছা দেই।

আমি বলতাম, অন্ধকারে উকুন কিভাবে বাছবে?

এইটাও একটা কথা। আচ্ছা শুয়া থাক, মাথায় হাত বুলায়া দেই। তর মা'রে বলিস না। সে রাগ করব। সে ভাবব আমি তার পুলারে নিয়া নিছি। একজনের পুলা কি অন্যজনে নিতে পারে? পারে না।

আমি তার কোলে মাথা রাখতাম।

ললিতা নানান কথা বলত। আমি খুব মজা পেতাম।

যেমন এক সন্ধ্যায় বলল,

কালো বামুন ধলা শূদ্র
বাঁইটা মুসলমান
ঘরজামাই আর পোষ্যপুত্র–
পাঁচ জনই হমান হমান।

ক' দেহি এর অর্থ কি?

আমি বললাম, জানি না।

তুই দেখি কিছুই জানস না। এর অর্থ এই পাঁচ জনই সমান খারাপ। আমার নাম ললিতা। ললিতা কে জানস?

না।

ললিতা হইল শ্রী রাধিকার সবচে' প্রিয় সখী। কৃষ্ণের সঙ্গে ললিতারও ঘটনা ছিল। কি ঘটনা বড় হইলে বুঝবি। এখন বুঝবি না। ললিতা যেই দেখত রাধা কাছে ধারে নাই ওম্নে ফুড়ুৎ কইরা কৃষ্ণের ঘরে ঢুকত।

বর্ষাকালের শুরুতে আমার বড় মামা কলকাতা থেকে বোনকে দেখতে এলেন। কলকাতায় বড় মামার ফার্মেসি আছে। ফার্মেসির নাম 'বকুল বালা আরোগ্য বিতান'। বোনের নামে ফার্মেসি দিয়েছেন। বোনের প্রতি তাঁর মমতা এখান থেকে বুঝা যায়। মা তার ভাইকে জড়িয়ে দীর্ঘ সময় হাউমাউ করে কাঁদলেন। ভাইবোনের মধ্যে অনেক কথাবার্তাও হলো। কী কথা, আমি জানি না। আমার সামনে কোনো কথা হয়নি। তবে তারা দু'জনে যে গোপন পরিকল্পনা করছেন তা বুঝতে পারলাম। দুপুরে ভাত খেতে বসেছি। বড় মামা বললেন, শোন ছোটন (মামা আমাকে ছোটন ডাকতেন) তোর মা এখানে ভয়াবহ কষ্টে আছে। আমি ঠিক করেছি তোর মাকে নিয়ে কলকাতা চলে যাব। সে সেখানেই থাকবে। তোর বাবার যদি মতিগতি ফেরে, তাহলে তোর মা আবার সংসার করতে আসবে। যদি না ফেরে তাহলে আর আসবে না। আমার সঙ্গেই থাকবে। তুই কি যাবি তোর মার সঙ্গে?

আমি বললাম, যাব।

তোকে কলকাতার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেব। তুই পড়াশোনা করবি।

আমি বললাম, আচ্ছা।

তোর বাবার সঙ্গে যে যোগাযোগ থাকবে না, তা না। তুই চিঠিপত্র লিখবি। তোর বাপের যদি ছেলে দেখতে ইচ্ছা করে সে এসে দেখে যাবে। ঠিক আছে?

হুঁ। ঠিক আছে।

তাহলে কী কী সঙ্গে নিবি, গুছিয়ে ফেল। তোর বাবা যেন কিছু না জানে। শুধু বাবা কেন, কাকপক্ষীও যেন না জানে।

কেউ জানবে না।

তোদের পাসপোর্ট করানো, ভিসা করানো– এসব অনেক ঝামেলা। গোপনে বর্ডার দিয়ে পাস করাব। আমার চেনাজানা লোক আছে। সমস্যা নাই। আমরা দহগ্রাম দিয়ে বর্ডার পাস করব। আমি কালই চলে যাব। সব ব্যবস্থা করে তিন-চার দিনের মাথায় চলে আসব। তুই আর তোর মা রেডি থাকবি। তোর হাতে একটা স্যুটকেস। তোর মার হাতে একটা। এর বেশি কিছু নেওয়া যাবে না।

পরদিন ভোরে মামা দহগ্রামে চলে গেলেন। বাবা গ্রামে আসেন বৃহস্পতিবারে। সেদিন সোমবার। হঠাৎ দুপুর বেলা বাবা চলে এলেন, সঙ্গে ললিতা। মার সঙ্গে অনেক দিন পর বাবা ভালো ব্যবহার করলেন। হাসিমুখে কথা বললেন। বাবা বললেন, কচুয়া কাচের চুড়ি তোমার পছন্দ। পাঁচ ডজন চুড়ি এনেছি। কচুয়া রঙের একটা শাড়িও এনেছি। শাড়ি পরো, হাত ভর্তি করে চুড়ি পরো, তারপর আমার সামনে এসে বসো এবং বলো তোমার বড় ভাই কী মতলবে এসেছে।

মা ভয়ে ভয়ে বললেন, বোনকে দেখতে এসেছে।

শুধু শুধু বোনকে দেখতে আসে নাই। তুমি পত্র লিখে তোমার ভাইকে আনায়েছ। ঠিক বলেছি?

না।

বাবা নির্বিকার ভঙ্গিতে বললেন, তুমি পত্রে কোনো কিছু জানাতে বাদ রাখো নাই। ললিতা মেয়েটার কথাও লিখেছ। সুরুজ মিয়ার কথা লিখছ। আমি খারাপ পাড়ায় যাই এটাও লিখেছ। কিছু বাদ দাও নাই। শুধু একটা জিনিস লিখতে ভুলে গেছ। আমি যে বোতল খাই এটা লেখো নাই। কিভাবে জানি জানো?

মা চুপ করে রইলেন। বাবা বিড়ি ধরাতে ধরাতে বললেন, পোস্ট-মাস্টার সাহেবের সঙ্গে আমার বন্দোবস্ত করা ছিল। কলকাতায় যেসব চিঠি তুমি পাঠাবে সেগুলো তিনি আগে আমাকে পড়াবেন, তারপর ব্যবস্থা নেবেন। তোমার ভাইকে লেখা তিনটা পত্র আমার পাঞ্জাবির পকেটে আছে। ইচ্ছা করলে পড়ে দেখতে পারো। এখন যাও শাড়ি পরো। হাতে চুড়ি পরো। কুয়ার পাড়ে বসো। দুইজন সুখ-দুঃখের কিছু আলাপ করি।

বাবা কুয়ার পাড়ে বসলেন, হাত ইশারায় আমাকে ডাকলেন। আমি ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে বাবার সামনে দাঁড়ালাম। বাবা বললেন, তোর টাউট মামাটা কই?

আমি বললাম দহগ্রাম গিয়েছেন। তিন-চারদিন পরে ফিরবেন।

দহগ্রামে কেন গেল? সেখানের মামলাটা কী?

আমি চুপ করে রইলাম। বাবা চাপা গলায় বললেন, যা জিজ্ঞেস করি তার উত্তর দিবি। সঙ্গে সঙ্গে দিবি। উত্তর দিতে এক সেকেন্ড দেরি হলে খেজুর কাঁটা দিয়ে চোখ তুলে দেব। বল দহগ্রামে কী ঘটনা?

আমি চাপা গলায় বললাম, মা আর আমি দহগ্রামের বর্ডার দিয়ে ইন্ডিয়া চলে যাব।

বাবা হাসিমুখে বললেন, বুদ্ধি তো ভালো বের করেছে। টাউটের টাউটামি বুদ্ধি। অগ্নিসাক্ষী করে বিয়ে করা অন্যের বউ ভাগায়ে নিয়ে চলে যাওয়া। উত্তম, অতি উত্তম। তুই এখন যা তোর মাকে নিয়ে আয়। ইন্ডিয়া চলে যাওয়ার আগে তোদের দু'জনের সঙ্গে কিছু গল্পগুজব করি। ললিতাও আমাদের সঙ্গে থাকুক, সেও শুনুক ঘটনা কি। ললিতাও কি ইন্ডিয়া যাইতে চাও? যাইতে চাইলে তাদের সাথে যাও। ভালো চরণদার আছে।

ললিতা বলল, আমি কোনোখানে যাব না। বাবা বললেন, পাছায় লাথি পড়লে উড়াল দিয়া যাবি। লাথি পড়ে নাই বইলা যাইতে চাস না।

আমরা চারজন বসে আছি। বাবার হাতে চায়ের কাপ। ললিতার মুখ হাসি হাসি। আমার মা সবুজ শাড়ি পরেছেন। তার হাত ভর্তি সবুজ চুড়ি। কী সুন্দর যে তাকে দেখাচ্ছে! যেন স্বর্গের ইন্দ্রাণী।

বাবা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, তুমি তোমার টাউট ভাইয়ের সঙ্গে বর্ডার ক্রস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছ বলে তোমার পুত্রের কাছে শুনলাম। ছেলেকে সঙ্গে না নেওয়া তোমার জন্য উত্তম হবে। কারণ তোমার টাউট ভাই পরে তোমাকে কুমারী বলে বিবাহ দেওয়ার চেষ্টা করবে। পুত্র সঙ্গে থাকলে সমস্যা। আমি উপদেশ দেব তোমার ছেলেকে রেখে যেতে। তারপরও যদি তাকে সঙ্গে নিতে চাও আমার আপত্তি নাই। তোমাদের দু'জনের উপর আমি অনেক অত্যাচার করেছি। তোমরা মুক্তির চেষ্টা নিবে এটাই স্বাভাবিক।

মা চমকে তাকালেন। তার চোখে সংশয়। বাবার কথা তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। আবার অবিশ্বাসও করতে পারছেন না। তিনি একবার বাবার দিকে তাকাচ্ছেন, একবার আমার দিকে তাকাচ্ছেন।

বাবা বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে মা-পুত দুইজনেই যাও। কিছুদিন থাকো। যদি আমার জন্যে মন কাঁদে পত্র দিবা। আমি নিয়া আসব। মন কাঁদার কোনো কারণ অবশ্য নাই।

বাবা আরেকটা বিড়ি ধরালেন। ধোঁয়া টেনে কায়দা করে ললিতার মুখে ধোঁয়া ছাড়লেন। ললিতা চোখ-মুখ কুঁচকে বলল, কী যে ঢং করেন।

বাবা বললেন, আমার কথা যা বলার বলেছি। তোমার ভাইকে কয়েকবার টাউট বলেছি। কাজটা ঠিক হয় নাই। তিনি তোমার বড় ভাই, কাজেই বয়সে ছোট হলেও আমার গুরুজন। তাছাড়া সে টাউটও না। বোনের প্রতি তার মমতা আছে। যা-ই হোক, দহগ্রাম পর্যন্ত যাওয়ার ব্যবস্থা আমি করে দেব। আমার পরিচিত একজন আছে, সে জিপ কিনেছে। জিপে করে চলে যাবে। ঠিক আছে?

মা ক্ষীণস্বরে বললেন, ঠিক আছে।

মন খোশ হয়েছে?

হুঁ।

তাহলে যাও, পাকশাক করো। তোমার হাতের রান্না ভালো। ললিতা মাগী রাঁধতে পারে না। এইটাই সমস্যা।

মা উঠে চলে গেলেন, ললিতা আমাকে নিয়ে মাছ মারতে বের হলো। সে আজ চাড় ফেলে মাছ ধরবে। কোনো এক নামকরা বর্শেলকে দিয়ে সে মাছের চাড় বানিয়ে এনেছে। কাগজে করে মাছবন্ধন মন্ত্রও লিখে এনেছে। এই মন্ত্র তিন বার পড়ে বড়শিতে ফুঁ দিলেই মাছ বড়শি গেলার জন্য দিশাহারা হয়ে ছুটে আসবে।

চার ফেলে পুকুরঘাটে আমার দু'জন বসে আছি। ললিতা পড়তে জানে না। কাজেই আমি কাগজে লেখা মন্ত্র তিন বার পড়ে বড়শিতে ফুঁ দিলাম–

আজা বাজা
মাছের পুত লাজা।
কালির মন্ত্র হুঙ্কার
আলি দিলেন টুঙ্কার।
বড়শি বলে আয়
দুনিয়ার মাছ ধরা খায়।

বড়শি ফেলে ললিতা বসে আছে। সে বলল, এখন কি মনে হয় তোর বাপ খুব ভালো মানুষ?

আমি বললাম, হুঁ।

ললিতা বলল, যে মন্দ সে সবসময় মন্দ। একজন মন্দ মানুষ হঠাৎ হঠাৎ ভালো হয় না। এক মন্দ মানুষ আরেক মন্দ মানুষরে চিনে। আমি মন্দ, আমি তোর বাপরে চিনি। তোর বাপের খারাপ কোনো মতলব আছে।

কী খারাপ মতলব?

সেটা বুঝতেছি না। এখন কথা বন্ধ। মাছ বড়শিতে ঠোকরাইতাছে। একদম চুপ।

নতুন চাড়ের গুণেই হোক বা মন্ত্রের কারণেই হোক ললিতা বিশাল এক কাতল মাছ ধরে বিকট চিৎকার করতে লাগল, 'পাইছিরে পাইছি। আইজ তোরে পাইছি।'

ললিতার হইচই এবং তীক্ষ্ণ স্বরের চেঁচামেচিতে বাবা পুকুর পাড়ে উপস্থিত হলেন এবং বিস্মিত হয়ে বললেন, 'করছে কী! কত বড় মাছ

ধরেছে। এই মাছ আমি পাকাব। মাথা দিয়ে মুড়িঘণ্ট। ঘরে মুগডাল কি আছে?'

বাবা উঠানের চুলায় নিজেই মাছ রান্না করলেন। ললিতা এবং মা দু'জনেই তার পাশে বসা। তারা রান্নায় সাহায্য করছেন। দেখে মনে হচ্ছে অতি সুখী পরিবার। বাবা ললিতার দিকে তাকিয়ে বললেন, একটা গীত গাও। ললিতা বলল, আমি গীত জানি না।

বাবা ধমক দিয়ে বললেন, মাগী তরে গাইতে বলছি গা। তুই যে কাননবালা না এইটা আমি জানি।

ললিতা গানে টান দিল,

আমি কই যাব, কারে শুনাব

আমার মনের দুক্ষের কথা রে ...

ললিতা বাড়িতে এলে মা আমাকে নিয়ে রাতে ঘুমাতেন। সেই রাতে ব্যতিক্রম হলো। বাবা সন্ধ্যারাতে মাকে ডেকে নিয়ে বললেন আজ রাতে তুমি আমার সঙ্গে ঘুমাও। চলে যাচ্ছ আর তো দেখা পাব না। বাকি জীবন কার না কার সঙ্গে ঘুমাবে। ভালো কথা, তোমার ছেলে কি একা ঘুমাতে পারবে? যদি ভয় পায় ললিতাকে বলি তার সঙ্গে ঘুমাতে।

মা বললেন, সে একা ঘুমাতে পারবে।

আমি একই ঘুমাতে গেলাম। শেষরাতে বিকট হইচই এবং কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙল। ললিতা আমার ঘরে ঢুকে হাত টেনে আমাকে বিছানায় তুলতে তুলতে বলল, সর্বনাশ হইছে গো। তোমার মা ফাঁস নিছে। তোমার বাপের সঙ্গে নাকি কথা কাটাকাটি হইছে। তার পরে পিন্দনের শাড়ি খুইল্যা গলায় পেঁচায়া ঝুইলা পড়ছে। রাম রাম, কী সর্বনাশ!

বড় মামার তিন দিন পর আসার কথা। তিনি পঞ্চম দিনে এলেন। এর মধ্যে শ্মশানে মাকে দাহ করা হয়েছে। শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানের তারিখ হয়েছে। বড় মামা বললেন, আমার বোন গলায় ফাঁস নিয়া মরার মেয়ে না।

বাবা বললেন, আপনার কী ধারণা? আমি গলা টিপে মেরেছি। তারপর ফাঁসে ঝুলায়েছি?

বড় মামা চুপ করে রইলেন।

বাবা বললেন, এক কাজ করেন, থানায় যান। আমার নামে ৩০২ ধারায় মামলা দেন।

বড় মামা বললেন, অবশ্যই মামলা করব। আপনাকে ফাঁসিতে ঝুলাব।

বাবা বললেন, একটা বিষয় খেয়াল রাখবেন। বিনা পাসপোর্টে এই দেশে ঢুকেছেন। পুলিশ আপনারে অনুপ্রবেশকারী হিসেবে সঙ্গে সঙ্গে অ্যারেস্ট করবে।

মামা বললেন, অ্যারেস্ট করলে করবে। আমি শেষ দেখে নেব।

দেখেন, শেষ দেখেন। কোনো অসুবিধা নাই। পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছেন। হাত-মুখ ধোন। খাওয়া-দাওয়া করুন। তারপর ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করুন, কী করবেন। আপনি আমার ছেলের সঙ্গেও পরামর্শ করতে পারেন।

তার সঙ্গে কী পরামর্শ করব?

সে যদি বলে সে নিজ চোখে দেখেছে, তার বাবা মাকে গলাটিপে মেরেছে, তাহলে শক্ত মামলা হবে।

বড় মামা দুই দিন থাকলেন। এই দুই দিন তিনি অন্ন স্পর্শ করলেন না। কুয়াতলায় মূর্তির মতো বসে রইলেন। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার, তিনি রাতে ঘুমাতেও গেলেন না। একই জায়গায় বসে রইলেন। তৃতীয় দিন ভোর বেলায় কাউকে কিছু না বলে চলে গেলেন।

নলিনী ভট্টাচার্য এই পর্যন্ত বলে থামলেন।

আমি বললাম, আপনার গল্পটা সুন্দর। আপনার বলার ভঙ্গিও ভালো। আপনার বড় মামার নাম বলেননি।

উনার নাম রামচন্দ্র।

আপনার গল্প আগ্রহ নিয়ে শুনেছি। তবে গল্পে তেমন বিশেষত্ব নাই। নষ্ট চরিত্রের একজন মানুষের হাতে স্ত্রী খুন। এ রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে। অতি শুদ্ধ মানুষও স্ত্রীকে খুন করে। তারপরেও আপনার ব্যক্তিগত গল্প আপনি সুন্দর করে বলেছেন। চলুন ঘুমাতে যাই।

নলিনী বাবু বললেন, মূল গল্পটা এখন শুরু করব।

এতক্ষণ যা বললেন তা মূল গল্প না?

না। এতক্ষণ প্রস্তাবনা করেছি। গল্পের ভূমিকা বলেছি। কিছুটা ক্লান্তও হয়েছি। একনাগাড়ে কথা বলায় ক্লান্তি আছে। একটা পান কি খাবেন?

না।

হালকা জর্দা দিয়ে একটা পান দেই। পান খেতে খেতে শুনুন। আপনার মুখ সচল থাকবে। আমি কথা বলছি আমার মুখ সচল। আপনি পান খাচ্ছেন, আপনারটা সচল।

পান দিন।

আমি পান মুখে দিলাম। নলিনী বাবু তার কথায়– মূল গল্প শুরু করতে গিয়ে আচমকা থেমে গেলেন।

আমি বললাম, থামলেন কেন? সমস্যা কি?

আপনি দু'বার হাই তুলেছেন। এটাই সমস্যা। আপনার ঘুম পাচ্ছে। আমি চাচ্ছি মূল গল্পটা আপনি ইন্দ্রিয় সজাগ রেখে শুনবেন।

আমি বললাম, আমার ঘুম পাচ্ছে এটা সত্যি। বাকিটা কাল সকালে শুনব।

নলিনী বাবু বললেন, গল্পটা আমি রাতে শুনাতে চাই। দিনে চারদিক থেকে শব্দ আসে। শব্দের কারণে ইন্দ্রিয় খানিকটা অসাড় হয়ে থাকে। যদি অনুমতি দেন একটা দিন থাকি। গল্পটা রাতে বলি?

অনুমতি দিলাম।

নলিনী বাবু বললেন, বিনিময়ে আমি আপনাকে রান্না করে খাওয়াব। আগামীকাল খাওয়াব শরীর শুদ্ধি খাবার। কিছু খাবার আছে শরীর শুদ্ধ করে।

খেতে নিশ্চয়ই কুৎসিত?

না। খেতে ভালো। যান ঘুমাতে যান। আমি কি আপনার গা হাত পা টিপে দেব। এতে ঘুম আসতে সাহায্য হবে।

ভাই আমার এম্নিতেই ঘুম হয়। ঘুম আনার জন্যে বাইরের সাহায্য লাগে না। তাছাড়া আপনি কেন আমার গা হাত পা টিপবেন।

একজন লেখককে সেবা করছি এটাই আমার লাভ।

আমি ঘুমুতে যাচ্ছি। আপনিও ঘুমাতে যান। আমি কারোর সেবা নেই না।

দুপুরবেলা শরীর শুদ্ধি যে খাবার নলিনী বাবু প্রস্তুত করলেন তার বর্ণনা দিতে চাচ্ছি। অনেক পাঠকের শরীর নিশ্চয়ই বিষাক্ত হয়ে আছে, তারা এই খাবারটা খেয়ে দেখতে পারেন। শরীর শুদ্ধ হবে কি না জানি না, তবে খেতে ভালো লাগবে।

নলিনী বাবু প্রথমেই আমার প্লেটে স্যুপের বাটির এক বাটি গরম ধোঁয়া ওঠা ভাত দিয়ে বললেন, ভাত এইটুকুই, এর বেশি খেতে পারবেন না।

আমি বললাম, আচ্ছা।

আঙুলে করে সামান্য নুন জিভের ডগায় ছোঁয়ান। এতে শরীর খাবার গ্রহণের জন্যে প্রস্তুত হবে। খাবার হজম করার জন্য যত জারক রস প্রয়োজন তাদের সবার কাছে ক্যামিকেল সিগন্যাল পৌঁছাবে যে খাবার আসছে।

আমি জিভে লবণ ছোঁয়ালাম।

শুরু করবেন উচ্ছে ভাজা দিয়ে। গরম পানি দিয়ে উচ্ছে ধুয়ে এনেছি এতে তিক্ত স্বাদ কম লাগবে। তবে তিক্ত স্বাদ দরকার। আপনি কি জানেন বিষের স্বাদ তিক্ত।

জানি। মানুষ যেন বিষাক্ত ফল না খায় এই জন্যেই প্রকৃতি বিষাক্ত ফল এবং খাবারের স্বাদ তিতা করেছে।

নলিনী বাবু বললেন, আমাদের শরীরেও বিষ আছে। করলার তিতা শরীরে যাওয়ায় বিষে বিষক্ষয় হবে।

আমি করলা খেলাম।

এটা হলো সজনে পাতার ভাজি। সজনে পাতাও শরীরের বিষ দূর করে। খেতে কেমন হয়েছে বলুন।

অসাধারণ হয়েছে। সজনে পাতা যে খাওয়া যায় এটাই জানতাম না।

পরের আইটেম রসুন ভর্তা। রসুন এবং কাঁচা মরিচ ভাপে সিদ্ধ করে চটকানো।

রসুন ভর্তা কোন উপকারে আসবে?

খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে শরীরে অনেক ভারী ধাতু ঢুকে যায়। নিশ্বাসের সঙ্গে ঢুকে সীসা। নদীর মাছের সঙ্গেও অনেক ভারী ধাতু শরীরে ঢুকে। রসুন এই ভারী ধাতুগুলি প্রস্রাবের সঙ্গে বের করে দেয়।

আমি বললাম, এই তথ্য কেমিস্ট্রির ছাত্র হিসাবে আমার জানা। আপনি কোত্থেকে জেনেছেন।

এক আয়ুর্বেদের কাছ থেকে জেনেছি। উনার নাম শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র আচার্য। ব্যাকরণ তীর্থশাস্ত্রী।

নেক্সট আইটেম।

এটা হলো মূল খাবার। খেয়ে বলুন কি?

প্রথমে মনে হলো আলু। হালকা হলুদ ঝোলে আলুর মতোই দেখা যাচ্ছে। মুখে দেয়ার পর বুঝলাম আলু না, পেঁপে। আলুর মতো গোল করে কেটে রান্না করা হয়েছে। খেতে অসাধারণ।

নলিনী বাবু বললেন, পেঁপে আপনার শরীরকে স্নিগ্ধ করবে। পাকস্থলী বলবান করবে। এর পরে খাবেন টক। অনেকে বলে খাট্টা। স্যুপের মতো চুমুক দিয়ে খাবেন। এই অম্ল শরীরের এসিডকে নিউট্রলাইজ করবে।

ডাল নেই?

না। ডাল কিডনির জন্য ভালো না। শেষ করবেন পায়েস দিয়ে। লবণ দিয়ে শুরু চিনি দিয়ে শেষ। খেয়ে তৃপ্তি পাচ্ছেন?

পাচ্ছি। ভাত আরেকটু নিতে পারলে ভালো হতো।

ভাত আর নিতে পারবেন না। পাকস্থলীর অর্ধেক খালি রাখতে হবে।

শরীর শুদ্ধি করে আরামের ঘুম দিলাম। ঘুম ভাঙল ঠিক আগের দিনের মতো সন্ধ্যাবেলা। তবে আজ বৃষ্টি নেই।

বসার ঘরে সোফায় বসে নলিনী বাবু নিবিষ্ট মনে কি যেন লিখছেন। আমি বললাম, কি লিখছেন।

নলিনী বাবু বললেন, সংস্কৃত শ্লোক। যে কয়টা মনে পড়েছে লিখে যাচ্ছি। হয়তো আপনার কাজে লাগবে।

আমি চোখ বুলালাম। নম্বর দিয়ে বেশ গুছিয়ে লেখা।

উদাহরণ—

১. পঙ্কো হি নভমি ক্ষিপ্তঃ
ক্ষেপ্তুঃ পতনি মূর্ধতি।
(কাদা উপরে ছুড়লে, যে ছুড়ে তার মাথায় এসে পড়ে।)

২. পঞ্চভি মিলিতৈঃ কিং যদ্দো গতিহ্ ন সাধ্যতে।
(পাঁচজন মিলে কাজ করলে জগতের সব কার্য সিদ্ধ হয়।)

৩. কো ন যাতি বশং লোকঃ মুখে পিন্ডেন পুরিতঃ।
(মুখে অন্ন তুলে দিলে কোন ব্যক্তি না বশীভূত হয়?)

সন্ধ্যা পুরোপুরি মিলাবার পর নলিনী বাবু আমাকে নিয়ে বারান্দায় বসলেন। বারান্দার বাতি নেভানো। ঘরের ভেতর থেকে আলো আসছে। নলিনী বাবু পান মুখে দিতে দিতে বললেন, মায়ের মৃত্যু পর্যন্ত আপনাকে বলেছি। এর পর থেকে শুরু করি?

আমি বললাম, করুন।

মায়ের মৃত্যুর পর ব্রাহ্মণ পুত্রকে কঠিন শোক পালন করতে হয়। আপনি কতটুকু জানেন আমি জানি না, একটু বলে নেই। ১৩ দিন পর্যন্ত হবিষ্যান্ন খেতে হয়। দিনে এক বেলা আহার। এক মুঠো আতপ চালের ভাত, কাঁচকলা সিদ্ধ, এক চামুচ গব্য ঘৃত। সাধারণ লবণ খাবারে দেওয়া যাবে না। দিতে হবে সৈন্ধব লবণ। রান্না নিজেকে করতে হবে। রান্নায় খড়ি ব্যবহার করা যাবে না। শুকনা পাতায় রাঁধতে হবে। খেতে হবে আঙট পাতায়। আঙট পাতা কি জানেন?

না।

আঙট পাতা হলো কলাপাতা। এই তের দিন কোনো চেয়ারে বসা যাবে না। খাটে শোয়া যাবে না। কুশাসন বা মৃগচর্ম ব্যবহার করা যেতে পারে। সূর্য ডুবে যাওয়ার পর ফল ছাড়া কিছুই খাওয়া যাবে না।

১৩ দিন পার হওয়ার পর হবে 'নিয়ম ভঙ্গ' অনুষ্ঠান। তখন নাপিত এসে মাথা, ভুরু সব কামিয়ে দেবে। সেলাই ছাড়া এক টুকরা নতুন কাপড় পরিয়ে দেবে।

আমার বয়স কম তারপরও আমাকে নিয়মমতো শোক পালন করতে হলো। নিয়ম ভঙ্গ অনুষ্ঠানের শেষে নিজের ঘরে ঢুকে মেঝেতে শুয়ে কাঁদতে কাঁদতে ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল পাঁচালি পাঠের আওয়াজে। বাবার

গলা– তিনি সুর করে পাঁচালি পাঠ করছেন। বাবাকে আমি কখনও পাঁচালি পাঠ করতে শুনিনি। মা পাঠ করতেন। বাবা বলতেন, কানের কাছে ঘ্যানঘ্যানানি করবা না। নীরবে পড়।

আমি অবাক হয়ে উঠে বসলাম। কিছুক্ষণ বাবার পাঁচালি পাঠ শুনলাম।

'সেদিন উনিশে জ্যৈষ্ঠ আর রবিবার
সকালে হয়েছে খোলা মন্দিরের দ্বার।
রামকুমার, চন্দ্র ভট্টাচার্য দু'জনে
বাবার মন্দিরে আসি প্রণাম চরণে ...

পাঁচালি শুনতে শুনতেই হঠাৎ লক্ষ করলাম আমার গায়ে সেলাই ছাড়া নতুন কাপড় না। সাধারণ কাপড়। মাথায় হাত দিয়ে দেখি মাথাভর্তি চুল। প্রথম প্রশ্ন মাথায় এলো, আমি কি স্বপ্ন দেখছি? অবশ্যই স্বপ্ন। আমার মাথা কামানো হয়েছে। মাথাভর্তি চুল থাকার কোনোই কারণ নাই।

আমি ঘর থেকে বের হলাম। দোতলা থেকে নামলাম।

বাবা কুয়াতলায় বসে পাঁচালি পড়ছেন। তার সামনে বড় মামা বসে আছেন। তিনি আগ্রহ নিয়ে পাঠ শুনছেন। বড় মামা তো চলে গেছেন। আবার কখন এসেছেন? বাবা আমাকে দেখেই হাত ইশারা করে কাছে ডাকলেন। নরম গলায় বললেন, বাবা! জ্বর কি কমেছে?

আমি কিছু না বলে দাঁড়িয়ে রইলাম। বাবা বললেন, কাছে আয় জ্বর দেখি।

আমি কাছে গেলাম। তিনি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন, গা এখনও খানিকটা গরম। তখন বড় মামা আমার মাথায় হাত দিলেন। মামা বললেন, নাহ জ্বর নেমে গেছে।

বাবা বললেন, তোর মা ঘাটে বসে আছে। মাকে ডেকে নিয়ে আয়। চা খাব।

আমি অবাক হয়ে ঘাটের দিকে যাচ্ছি। এখন আর মনে হচ্ছে না আমি স্বপ্ন দেখছি। এখন মনে হচ্ছে মায়ের মৃত্যুর ব্যাপারটা ছিল স্বপ্ন। এখন যা দেখছি সেটাই বাস্তব। মা মারা যাননি। বেঁচে আছেন।

ঘাটে মা না, ললিতা ছিপ হাতে বসে আছে। সে আমাকে দেখে মায়ের মতো করে মিষ্টি গলায় বলল, আমার বাবুটার জ্বর কমেছে? দেখি দেখি জ্বরটা দেখি।

আমাকে তার কাছে যেতে হলো না। সে এসে কপালে হাত রেখে আনন্দিত গলায় বলল, শরীর গাঙের পানির মতো ঠাণ্ডা। জ্বর নাই! আমার বাবুর জ্বর নাই নাই রে। তাইরে নাইরে না রে।

আমি হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। মাথার ভেতরটা তখন পুরোপুরি এলোমেলো। সব তালগোল পাকিয়ে গেছে। ঘটনা কিছুই বুঝতে পারছি না। একবার মনে হলো এক্ষুনি মাথা ঘুরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাব। শরীর কেমন জানি করছে। প্রচণ্ড পিপাসা হচ্ছে। ললিতা হাত ধরে টেনে তার পাশে আমাকে বসাল। পানিতে বড়শি ফেলে গানের সুরে বলতে লাগল—

নাই নাই নাই
বাবুর জ্বর নাই।
দীঘির জলে বড়শি ফেলি
বিশাল মাছ পাই।

সেদিনের অভিজ্ঞতা আপনাকে ঠিকমতো গুছিয়ে বলতে পারছি না। তা সম্ভবও না। আপনি লেখক মানুষ। লেখকদের কল্পনাশক্তি প্রবল হয় বলে শুনেছি। আপনি কল্পনা করে নিন। জলের মাছ ডাঙ্গায় বাস করতে এলে যা হয়, তাই। কিংবা ডাঙ্গার কোনো প্রাণীকে হঠাৎ জলে বাস করতে দিলে যা হয়।

আমি ললিতার পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালাম। ঘরের দিকে হাঁটা শুরু করলাম। ললিতা পেছন থেকে ডাকল, এই বাবু যাস কই। একটু বস না। মা'র সাথে কিছুক্ষণ বসলে কি হয়?

আমি ফিরেও তাকালাম না। বাবার সামনে দিয়ে ঘরে ঢুকে গেলাম। বাবা তখনও মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে পাঁচালি পড়ছেন।

বেদনায় মৌন মূক বাক্য নাহি স্বরে
চুক্ষ মেলি লোকনাথ চাহে ধীরে ধীরে।

একতলায় ঢুকে ঝাঁটার শব্দ পেলাম। বাড়ির সম্মুখ বারান্দা কে যেন ঝাঁট দিচ্ছে। আমি গেলাম সেখানে। মা বারান্দা ঝাঁট দিচ্ছেন। মা'র শাড়িটা মলিন, মুখ মলিন। আমি চাপা গলায় ডাকলাম, মা!

মা চমকে ফিরে তাকালেন। হাসলেন। ঝাঁটা ফেলে আমাকে জড়িয়ে ধরে প্রায় ফিসফিস করে বললেন, 'পেরায়ই তুমি আমারে মা ডাকো। কেন ডাকো বাবু? তোমার মা কোনোদিন জানলে মনে বেজায় কষ্ট পাইব। আমি

তো তোমার মা না। দাসীরে মা ডাকতে হয় না। তয় বাবু, তুমি যখন মা বইল্যা ডাক দেও, আমার কইলজা জুড়ায়া যায়।'

হিন্দুরা জন্মান্তরে বিশ্বাস করে। ছোটবেলা থেকে আমরা এই বিষয়ের গল্পগাথা শুনি। জাতিস্মর বালকের গল্প, যার পূর্বজন্মের স্মৃতি আছে– এসব।

আমার মনে হলো, এ ধরনের কিছু আমার হয়েছে। আমি আবার নতুন করে পৃথিবীতে জন্ম নিয়েছি। তবে পূর্বজন্মের স্মৃতি আমার আছে। আগের জগতের চেয়ে নতুন এই জগৎ সম্পূর্ণই আলাদা।

দিন সাতেক পার হওয়ার পর আমি যা বুঝলাম তা হলো আমার এই বাবা অতি ভালো মানুষ। ধর্মকর্ম নিয়ে থাকেন। আমাদের বাড়িটা ঠাকুর্দা বানিয়ে দিয়ে গেছেন। বড় মামা আমাদের সঙ্গে থাকেন। কাজকর্ম কিছু করেন না। তাঁর একটা ফার্মেসি আছে। ফার্মেসির নাম ললিতা আরোগ্য বিতান। সেই ফার্মেসি কর্মচারী চালায়। বড় মামা বেশিরভাগ সময় ঘরেই থাকেন।

আমাদের দাসী (আমার মা) অনেক দিন থেকেই এই বাড়িতে আছে। সে লেখাপড়া জানে। তাকে প্রায়ই দেখা যায় কুয়াতলায় বসে লুকিয়ে লুকিয়ে বই পড়ছে।

সব মিলিয়ে আমাদের অতি সুখের এক সংসার। একটাই শুধু কষ্ট। আমার মা এখানে দাসী। আমার এটাই মূল গল্প। আপনার মতামত শোনার পর আরও কিছু বলব।

নলিনী বাবু থামলেন। একনাগাড়ে কথা বলে তিনি খানিকটা ক্লান্তও হয়েছেন। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, আমি ধূমপান করি না। কিন্তু কেন জানি ধূমপান করতে ইচ্ছা হচ্ছে।

আমি সিগারেটের প্যাকেট তার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, আপনি হঠাৎ নতুন এক জগতে ঢুকে গেলেন। এই বিষয়ে কারো সঙ্গে কথা বলেছেন?

বড় মামাকে বলেছি। তিনি সব শুনে বলেছেন, টাইফয়েড হবার কারণে এইসব তোর মনে হচ্ছে। টাইফয়েড খারাপ রোগ। এতে অঙ্গহানি হয়। মাথার গোলমাল হয়। ভিটামিন খেতে হবে। কড লিভার ওয়েল খেতে হবে।

বড় মামা আমাকে তার ফার্মেসি থেকে ভিটামিন আর কড লিভার ওয়েল ক্যাপসুল এনে দেন।

নতুন জগতে আপনি কতদিন ছিলেন?

তিনি সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, তিন বছর।

আমি বললাম, হঠাৎ একদিন আগের জায়গায় ফিরে এলেন?

হুঁ।

এসে কি দেখেন এখানেও তিন বছর পার হয়েছে?

হ্যাঁ। মঙ্গলবার সকাল ন'টার সময় ঘটনাটা ঘটে। আমি আগের অবস্থায় ফিরে গিয়ে দেখি সকাল ন'টা বাজে। মঙ্গলবার। চৈত্র মাস।

আপনার পোশাক কি একই ছিল?

না।

আমি বললাম, আপনার এক পরিবেশ থেকে আরেক পরিবেশের ট্রানজিশানের ঘটনাটা বলুন।

নলিনী বাবু বললেন, স্কুলে যাওয়ার জন্য তৈরি হচ্ছি, তখন ললিতা অর্থাৎ ওই জগতে আমার মা বলল, বাবু স্কুলে আজ না গেলি। তোর গা গরম। মনে হয় জ্বর আসছে। শুয়ে থাক। আমি বললাম, আচ্ছা। চাদর গায়ে চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকলাম। সে বসল আমার মাথার পাশে। চুলে বিলি কাটতে কাটতে বলল, বাবু তোকে একটা কথা জিজ্ঞেস করি?

আমি বললাম, করো।

দাসী মেয়েটাকে তুই মা ডাকিস কি জন্য? আমি নিজেও কয়েকবার শুনেছি। ছিঃ বাবা ছিঃ আমি কি তোকে কম আদর করি? বাইরের কেউ শুনলে নোংরা অর্থ করবে। করবে না?

আমি বললাম, হুঁ।

তোর বাবা সাধু-সন্ন্যাসীর মতো মানুষ। লোকে তখন তাকে নিয়ে আজেবাজে কথা বলবে। সেটা কি ভালো হবে?

আমি বললাম, না।

ললিতা বলল, আমি ঠিক করেছি দাসী মেয়েটাকে আমি তাড়ায়ে দিব। যন্ত্রণা আমার ভালো লাগে না।

আমি বললাম, তুমি যদি তাকে তাড়ায়ে দাও আমি ছাদে উঠে ছাদ থেকে লাফ দিব।

এই সব কি বলো?

যা বললাম তাই করব।

ঐ রাক্ষসী মেয়ে তো তোমারে জাদুটোনা করেছে। জাদুটোনা ছাড়া এটা সম্ভব না। এই রাক্ষসীরে আমি কালই বিদায় করব।

বিদায় করবা না। সে আমার মা।

তাহলে আমি কে?

তুমি একটা খারাপ মেয়ে।

আমি খারাপ মেয়ে? আমি? কেন আমি খারাপ মেয়ে সেটা বলো। গোছায়ে বলো। আমি রাগ করব না। মন দিয়ে শুনব।

আমি জবাব দিলাম না। এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। ঘুম ভাঙল বাবার চিৎকার-চেঁচামেচিতে। সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে দেখি বাবার এক হাতে একটা চ্যালা কাঠ, অন্য হাতে তিনি ললিতার চুল ধরে আছেন। তার শাড়ির সবটাই মাটিতে লুটাচ্ছে। গায়ে ব্লাউজ এবং পেটি কোট ছাড়া কিছু নেই। ললিতা নিঃশব্দে কাঁদছে। বাবা অতি নোংরা ভাষায় তাকে গালি দিচ্ছেন। বাবা বলছেন, আজ তোর কপালে মরণ আছে। তোকে নেংটা করে বাড়ি থেকে বের করে দেব। গায়ে একটা সুতা থাকবে না। নেংটা হেঁটে বাজারে গিয়ে উঠবি। ঘণ্টা হিসেবে ভাড়া খাটবি। এক ঘণ্টা একশ টাকা। সঙ্গে সঙ্গেই বুঝলাম আমি আগের কদর্য জগতে চলে গেছি। সাধুর মতো বাবার জায়গায় পিশাচ বাবার আগমনও ঘটেছে।

নলিনী বাবু আরেকটা সিগারেট ধরাতে ধরাতে বললেন, আমি আমার এই নোংরা বাবার সঙ্গে অতি নোংরা পরিবেশে বাবার মৃত্যু পর্যন্ত ছিলাম। তারপর হঠাৎ করে ফিরে যাই অতি শান্তিময় এক ভুবনে।

আমি বললাম, এমন কি হতে পারে না যে, প্রবল ইচ্ছাপূরণ চেষ্টার কারণে আপনার ব্রেইন এসব আপনাকে দেখাচ্ছে?

নলিনী বাবু বললেন, সেই সম্ভাবনা নেই। কারণ আমার শান্তির জগতেও কঠিন কিছু বেদনা আছে। সেখানে আমার মা দাসী। বিষয়টা কখনোই কোনো সন্তানের ইচ্ছাপূরণের অংশ হতে পারে না।

আমি বললাম, কোয়ান্টাম থিওরি প্যারালাল ইউনিভার্সে কথা বলে। তাদের একটা থিওরি আছে Many world theory, সেখানে অসংখ্য সম্ভাবনার অসংখ্য জগৎ একই সঙ্গে থাকে। একটিতে আপনি সুখে আছেন একটিতে আপনি দুঃখে আছেন এসব। কিন্তু সেখানেও এক জগৎ থেকে আরেক জগতে যাওয়া সম্ভব না। তাতে Wave function collapse করে। আপনাকে মনে হয় ঠিকমতো বুঝাতে পারছি না।

নলিনী বাবু বললেন, একেবারেই যে বোঝাতে পারছি না তাও কিন্তু না। এ জগতে আমি একজন বিএসসি শিক্ষক। কিন্তু ওই জগতে আমি পদার্থবিদ্যার একজন শিক্ষক। আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াই।

আমি বললাম, ওই জগতের স্মৃতি যেহেতু আপনার আছে, পদার্থবিদ্যা যা শিখেছেন তার স্মৃতিও নিশ্চয়ই আছে।

নলিনী বাবু বললেন, আছে। সামান্যই আছে, তবে আছে। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন।

আমি বললাম, আমি তো কেমিস্ট্রির মানুষ। পদার্থবিদ্যার পড়াশোনা সামান্য। তারপরও বলুন মাধ্যাকর্ষণজনিত ত্বরণের সমীকরণটা কী?

নলিনী বাবু বললেন, $g = v/(t \sin x)$

আমি বললাম, ঠিক আছে। আইরিশ পদার্থবিদ Fitz Gerald-এর সমীকরণটা কি মনে আছে?

নলিনী বাবু বললেন, মনে আছে। তিনি বস্তুর দৈর্ঘ্য তার চলার গতির সঙ্গে কীভাবে কমে তার সমীকরণ বের করেছিলেন। Michelson-Moreley পরীক্ষায় এই সমীকরণ ব্যবহার করা হয়েছিল। সমীকরণটা বলব?

না তার প্রয়োজন নাই।

এই প্রথম আমি সামান্য চিন্তিত বোধ করলাম। একজন স্কুলের বিএসসি শিক্ষকের Fitz Gerald সমীকরণ জানার কথা না। একই সঙ্গে একজন মানুষ Parallel দুই জগতে বাস করার কথাও না। বিজ্ঞান অনেক সম্ভাবনার কথা বলে। সম্ভাবনা সম্ভাবনাই। কল্পবিজ্ঞান এবং বাস্তবতা এক জিনিস না। আমি বললাম, আপনি যে দুটি জগৎ দেখছেন তাদের মধ্যে মিল এবং অমিল কী?

নলিনী বাবু বললেন, দুটি আসলে একই।

তার মানে? বুঝিয়ে বলুন। তার আগে আপনার জগৎ দুটি আলাদা করি। একটার নাম দেই দুঃখ জগৎ, যেখানে আপনার মা মারা গেছেন। আর একটার নাম দেই শান্তি জগৎ, যেখানে আপনার মা বেঁচে আছেন যেখানে একজন দাসী আপনার মা। এই দুই জগতে মিলটা কোথায়?

নলিনী বাবু বললেন, আমার বাবার কথা ধরুন। দুঃখ জগতে আমার বাবার স্ত্রী মারা যান কিংবা তাকে মেরে ফেলা হয়। শান্তি জগতেও একই ঘটনা ঘটে। তার স্ত্রী ললিতা মারা যান কিংবা তাকে মেরে ফেলা হয়।

কে তাকে মেরে ফেলে?

আমার বাবা।

আপনি তো বললেন, শান্তি জগতে আপনার বাবা অতি ভালো মানুষ। ধর্মকর্ম নিয়ে থাকেন।

শুরুতে তা-ই মনে হয়েছিল। যতই দিন যেতে লাগল আমি বুঝতে পারলাম বাবার মধ্যে বিরাট সমস্যা আছে। ধর্মকর্মের আড়ালে তিনি ভয়ঙ্কর একজন মানুষ। বাড়ির দাসীর সঙ্গে তার সম্পর্ক আছে। আমি ওই দাসীর গর্ভে জন্ম নেওয়া এক ছেলে। সামাজিকতার কারণে আমার পরিচয় আমি তার বিবাহিত স্ত্রীর সন্তান। এখানে মিলটা লক্ষ করুন। দুঃখ জগতে যিনি আমার মা, তিনিই আবার শান্তি জগতেও আমার মা। দুঃখ জগতে বাবার স্ত্রী মারা যান। শান্তি জগতেও বাবার স্ত্রী মারা যান।

তিনি কীভাবে মারা যান?

ঝাঁপ দিয়ে কুয়াতে পড়েছিলেন। আমার ধারণা, বাবা তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলেছেন। বাবার পক্ষে অসম্ভব কিছু না। তিনি অতি ভয়ঙ্কর মানুষদের একজন। অথচ এত মিষ্টভাষী। তার মুখে সারাক্ষণ সাধু-সন্ন্যাসীদের গল্প।

আমি বললাম, ঘটনা তো খুবই জটিল হয়ে যাচ্ছে।

নলিনী বাবু বললেন, জটিলতা অবশ্যই আছে। আমি নিজে জট খোলার অনেক চেষ্টা করেছি। তবে আমি মোটামুটি মূর্খ একজন মানুষ।

আমি বললাম, শান্তি জগতে আপনি পদার্থবিদ্যা পড়ান। কাজেই নিজেকে মূর্খ বলা কি ঠিক হচ্ছে?

এই জগতের আমি কিন্তু মূর্খ। এই জগতের আমির চিন্তা-ভাবনাও সাধারণ। তবে দুটি জগৎ নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। দুঃখ জগতে যাদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে, শান্তি জগতেও তাদের সঙ্গে আমার পরিচয়।

আমি বললাম, তা-ই যদি হয় তাহলে শান্তি জগতেও নিশ্চয়ই আপনি আমার দেখা পেয়েছেন।

জি পেয়েছি।

আমি বললাম, সে বিষয়ে বলুন।

নলিনী বাবু বললেন, আজ না। আরেক দিন বলব। রাত দু'টা বাজে। আপনি ঘুমুতে যান। আমি লক্ষ করেছি, আপনি ঘন ঘন হাই তুলছেন। আপনার ঘুম প্রয়োজন। আমি নিজেও ক্লান্ত।

আমি ঘুমুতে গেলাম। পরদিন ঘুম ভাঙল অনেক বেলায়। খোঁজ নিয়ে জানলাম, নলিনী বাবু ভোরবেলা চলে গেছেন। ফ্ল্যাটের দারোয়ানের কাছে আমাকে লেখা একটা চিঠি রেখে গেছেন। চিঠি জোগাড় করে পড়লাম। তিনি লিখেছেন–

মহাশয়

আমার প্রণাম নিবেন। গত রাতে আপনার সঙ্গে উদ্ভট কিছু আলোচনা করেছি। আমার ধারণা, আমি আপনার শান্তি বিঘ্নিত করেছি।

আমি একজন মানসিক রোগী। বর্তমানে চিকিৎসাধীন আছি। রোগের প্রকোপ প্রবল হলে আমাকে মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আমার ধারণা তখনই দুই জগৎ নামক উদ্ভট চিন্তা আমার মাথায় আসে।

ধারণা না। ইহাই সত্য। আপনার সময় নষ্ট করার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি। নিজ গুণে ক্ষমা করবেন।

ইতি

বাবু নলিনী ভট্টাচার্য।

চিঠি শেষ করে আমি মনে মনে বললাম 'হোলি কাউ' এর আক্ষরিক অর্থ পবিত্র গাভী। আমেরিকানরা কোনো কারণে বড় ধরনের ধাক্কা খেলে পবিত্র গাভীর নাম নেয়। পড়াশোনার কারণে দীর্ঘদিন আমেরিকায় থাকতে হয়েছে বলেই হয়তো তাদের স্বভাবের খানিকটা আমার মধ্যে চলে এসেছে।

একজন মানসিক রোগীর গল্প কেউ মাথায় নিয়ে বসে থাকে না। আমি নিজেও থাকলাম না। আমার স্মৃতিতে নলিনী বাবু চমৎকার একজন রাঁধুনি হিসেবে থেকে গেলেন। কোথাও ভালো কোনো খাবার খেলে নিজের অজান্তেই বলি, বাহ্ নলিনী বাবুর রান্না।

তাঁর লিখে রেখে যাওয়া বত্রিশটি সংস্কৃত শ্লোকের খাতা মাঝে মধ্যে দেখি, লেখালেখিতে কোনোটার ব্যবহার করা যায় কি না। কোনোটাই ব্যবহার করতে পারিনি। তবে সংস্কৃত শ্লোকের পাশে লেখা নলিনী বাবুর টীকা পড়ে মজা পেয়েছি। শ্লোকের চেয়ে টীকাগুলি মজার। উদাহরণ–

শ্লোক

অধরে স্ব মৃতং হি যোষিতাং
হৃদি হলাহলমেব কেবলম

অর্থ

রমণীদিগের অধরে অমৃত
কিন্তু হৃদয়ে শুধুই হলাহল বিষ।

টীকা

ভুল শ্লোক। মেয়েদের এই শ্লোকে
ছোট করা হয়েছে। তাছাড়া যার মুখে
অমৃত তার অন্তরেও থাকবে অমৃত।
হৃদয়ের অমৃতই মুখে আসে। যার
হৃদয় হলাহলপূর্ণ, তার অধরে
হলাহল থাকবে। উদাহরণ আমার
বাবা শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য। (দুঃখ জগতের বাবা)

শীতকালের এক সন্ধ্যায় অবসর প্রকাশনীর মালিক, আমার পুরানো বন্ধুদের একজন উত্তরার বাড়িতে আমাকে দেখতে এলেন। তাঁর প্রকাশনা থেকে রান্নার একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বইটি সঙ্গে করে এনেছেন। নানান কথাবার্তা হচ্ছে। প্রকাশকের বই প্রকাশ নিয়ে বিড়ম্বনার কথা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে তিনি বললেন, আপনার কি মিরপুরের কথা মনে আছে। কি বিপাকেই না পড়েছিলাম।

মিরপুরের ঘটনা মনে পড়ল। একই সঙ্গে নলিনী বাবুও প্রবলভাবে ফিরে এলেন। কারণ ব্যাখ্যা করা উচিত।

আমি তখন শহীদুল্লাহ হলে থাকি। হাউস টিউটর। একের পর এক বই লিখে যাচ্ছি। নিষাদ নামে একটা সায়েন্স ফিকশন এই সময়ে লেখা। বিষয়বস্তু একটি যুবক একই সঙ্গে দুই জগতে বাস করছে। Parallel Universe কনসেপ্টের সায়েন্স ফিকশন। তখন খবর পেলাম মিরপুরের একটি মেয়ে এই বইটি পড়ার পর ভয়াবহ সমস্যায় পড়েছে। সে দাবি করছে, দুটি জগতে সে ঘোরাফেরা করছে। সাতদিন পার হয়েছে সে অঘুমা। ডাক্তাররা ঘুমের ইনজেকশন দিয়েও তাকে ঘুম পাড়াতে পারছেন না। ডাক্তাররা বলেছেন, বইটির লেখক উপস্থিত হলে তিনি এই জটিল সমস্যার সমাধান হয়তো দিতে পারবেন।

আমি একা উপস্থিত হওয়ার সাহস করলাম না। চার-পাঁচজনের একটা দল নিয়ে উপস্থিত হলাম। দলে আছেন অবসর প্রকাশনীর মালিক আলমগীর রহমান, দৈনিক বাংলার সহ-সম্পাদক সালেহ চৌধুরী, বাংলা একাডেমীর একজন কর্মকর্তা ওবায়দুল ইসলাম।

বাসায় পৌঁছে দেখি ভয়াবহ অবস্থা। ষোল-সতেরো বছরের এক তরুণী। তার চোখ রক্তবর্ণ। মুখ দিয়ে ফেনা ভাঙছে। তাকে ঘিরে আছে আত্মীয়-স্বজন এবং ডাক্তার। মেয়েটার পুরোপুরি হিস্টিরিয়াগ্রস্ত অবস্থা। সে (তার নাম এখন আর মনে করতে পারছি না) আমাকে দেখে বিড়বিড় করে বলল, 'আপনি আমাকে বাঁচান।' মেয়েটার বাবা সম্ভবত একজন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি আমাকে দুঃখিত গলায় বললেন, এসব কী লেখেন। কেন লেখেন?

মেয়ের বাবা এবং আত্মীয়স্বজনের সামনে নিজেকে খুবই অসহায় লাগছিল। মনে হচ্ছিল আমি বইটি লিখে বিরাট অপরাধ করেছি। আলমগীর রহমান ভীতু প্রকৃতির মানুষ। বইটির প্রকাশক হিসেবে তাঁর নাম চলে আসে কি-না এই ভেবেই হয়তো বারান্দায় চলে গেলেন। বারান্দা এবং উঠান

ভর্তি পাড়ার ছেলেপুলে। তাদের দেখে তিনি শুকনা মুখে আবার ঘরে ঢুকলেন।

আমি মেয়েটিকে বললাম, তুমি শান্ত হও। আমি বইয়ে যা লিখেছি সবই লেখকের কল্পনা। জগৎ একটাই। তুমি ভিন্ন ভিন্ন জগতে যাওয়া-আসা করছ, তা তোমার কল্পনা।

মেয়েটি ক্রুদ্ধ গলায় বলল, আমি যা দেখছি সবই সত্য। আমি কেন বানিয়ে বানিয়ে কথা বলব। আমার লাভ কি?

মেয়ে কাঁদছে, মেয়ের মা কাঁদছেন। বিশ্রী অবস্থা।

সেই রাতেই মেয়েটিকে শমরিতা হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। তাকে পেথিড্রিন ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়ানো হলো। সপ্তাহখানেক চিকিৎসার পর তার অবস্থা কিছুটা ভালো হলে আমি তাকে দেখতে গেলাম। দুই জগতে সে কী দেখেছে তা ভাঙা ভাঙাভাবে কিছুটা শুনলাম।

তার দ্বিতীয় জগৎটায় আলো অনেক বেশি। সবাই হাসি-খুশি। সেই জগতেও একজন হুমায়ূন আহমেদ আছে। এবং সেই হুমায়ূন আহমেদের সঙ্গে মেয়েটা নাকি বিশেষভাবে পরিচিত। দ্বিতীয় জগতের হুমায়ূন আহমেদের বয়স কম, এবং অবিবাহিত।

মেয়েটির কথাবার্তা থেকে আমার মনে হলো লেখকের সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হবার প্রবল বাসনাই তার মধ্যে দ্বিতীয় জগতের বিভ্রম তৈরি করেছে।

তারপর বহু বছর কেটেছে। আমি নলিনী বাবুর দেখা পেয়েছি। বিস্ময়ের কথা হলো, তিনিও নিষাদ বইটা পড়েছেন। এখানে মিরপুরের মেয়েটির সঙ্গে নলিনী বাবুর কিছু অমিল আছে। মিরপুরের মেয়ে 'নিষাদ' পড়ার পর দ্বিতীয় জগতে গেছে। নলিনী বাবু দ্বিতীয় জগৎ ঘুরে আসার অনেক পরে নিষাদ বইটি পড়েছেন। তাঁর এক ছাত্রী তাঁকে বইটি পড়তে দিয়েছিল। ছাত্রীর নাম সুলতানা বেগম, দশম শ্রেণী, খ শাখা। বিজ্ঞান বিভাগ। মিসির আলির কাছ থেকে তার কাছ থেকে বিস্তারিত জানার কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। আমি ঠিক করলাম, নীলগঞ্জ যাব। নলিনী বাবুকে খুঁজে বের করব। তার সঙ্গে কথা বলব, তার সহকর্মীদের সঙ্গে কথা বলব। তার সম্পর্কে যা জানার সব জানব।

যা ভেবেছি তা করা হলো না। আমরা অতি ব্যস্ত এক জগতে বাস করি। নিজের প্রয়োজনের বাইরে সময় বের করা হয়ে ওঠে না। এক সময় নলিনী বাবুর কথা ভুলেই গেলাম। না ভুলে উপায়ও ছিল না। আমি তখন চন্দ্র-কথা নামে নতুন এক ছবিতে হাত দিয়েছি। অর্থের জোগান নেই। গল্প-

উপন্যাস লিখে বাড়তি টাকা জোগাড় করার চেষ্টা করি। টাকার অভাবে ছবি বন্ধ হবার জোগাড়। মহাচিন্তায় আমি অস্থির। নলিনী বাবু আমার ব্যক্তিগত চিন্তার কুয়ায় পড়ে পুরোপুরি ডুবে গেলেন। প্রকৃতি তখন ছোট্ট একটা খেলা খেলল।

প্রকৃতির খেলা ব্যাখ্যা করার আগে জল-বিলাস প্রসঙ্গে বলে নেই। জল-বিলাস আমার বজরার নাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বজরায় চড়ে পদ্মা নদীতে ঘুরে বেড়াতেন। নদীর উপর রাত্রি যাপন করতেন। রবীন্দ্রনাথ হওয়া সম্ভব না, তবে তাঁর অনুকরণ করা সম্ভব। আমি বজরা বানালাম। নাম দিলাম জল-বিলাস। নুহাশ পল্লীর পাশের খালে বজরা ভাসানো হলো। খাল দিয়ে কিছু দূর গেলেই হাওরের মতো জায়গা পড়ে। হাওরের নাম লবণদহ। আমি ঠিক করলাম বইপত্র নিয়ে বজরায় দিন যাপন করব।

বজরার ডিজাইন করল এফডিসির সেট ডিজাইনার কুদ্দুস। আধুনিক বজরা। ছোট জেনারেটর আছে। জেনারেটরের কারণে ফ্যান চলে, বাতি জ্বলে। টয়লেটে কমোড বসানো। বজরার ছাদে চেয়ার পাতা। মোটামুটি রাজকীয় ব্যবস্থা।

আমি মহাউৎসাহে বজরায় ঘুরে বেড়াই। নিজেকে রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ মনে হয়। প্রায়ই এমন হয়েছে যে ঝুম বৃষ্টি, আমি বজরার জানালা দিয়ে বৃষ্টি দেখতে দেখতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান শুনছি।

"আমি কান পেতে রই আমার আপন
হৃদয় গহন দ্বারে
কোন গোপন বাসীর কান্নাহাসির
গোপন কথা শুনিবারে।
ভ্রমর সেথায় হয় বিবাগি
নিভৃত নীলপদ্ম লাগিরে
কোন রাতের পাখি গায় একাকী
সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে।"

এই একটি গানই বারবার শুনা হয়, কারণ আমি নিজে তখন 'সঙ্গীবিহীন' অন্ধকারেই বাস করছি। আমাকে নিয়ে কিছু কিছু পত্রিকা সেই সময় বাড়াবাড়ির চূড়ান্ত করছে। আমাকে এবং গায়িকা-অভিনেত্রী শাওনকে নিয়ে উদ্ভট সব কথাবার্তা ক্রমাগত ছাপিয়ে যাচ্ছে। কথাবার্তার নমুনা– হুমায়ূন আহমেদ শাওনকে উত্তরার একটি ফ্ল্যাট কিনে দিয়েছেন। শাওন সেখানে তাঁর শিশুপুত্র নিয়ে বাস করেন। মাঝে মাঝে হুমায়ূন আহমেদ সেখানে রাত্রি

যাপন করতে যান। উল্লেখ্য, শিশুপুত্রটি হুমায়ূন আহমেদের ঔরসজাত, যদিও তিনি শাওনকে বিবাহ করেননি।

আমেরিকার একটি বাংলা পত্রিকায় উত্তরার সেই বাড়ি এবং বাড়ির বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকা কুচকুচে কালো এক ছেলের ছবিও ছাপা হলো। ছেলেটি দাঁত বের করে হাসছে। তার গায়ের গাঢ় কৃষ্ণ বর্ণের কারণে দাঁত ঝকঝকে সাদা দেখাচ্ছে।

একটি পত্রিকা আমার মেজ কন্যা শীলার একটা ইন্টারভিউ ছাপাল। শিরোনাম– শীলা হুমায়ূন আহমেদকে একবারও বাবা সম্বোধন করেননি।

আমি প্রতিবাদ করে লেখা ছাপাতে পারতাম, উকিল নোটিশ পাঠাতে পারতাম। কেন জানি কিছুই করতে ইচ্ছা করল না। তার একটি কারণ, আমার সংসার টিকেনি এটা সত্য এবং আমি অতি অল্পবয়সী শাওনের প্রেমে পড়েছি এটাও সত্যি।

আমি যা করলাম তা হলো নিজেকে গুটিয়ে নেয়া। বৈরী সময়ে শামুক নিজেকে খোলসের ভেতর ঢুকিয়ে ফেলে, আমার জল-বিলাস হলো আমার খোলস। খোলসের ভেতর দিন এবং রাত্রি যাপন। সেখানেই খাওয়া-দাওয়া এবং লেখালেখির চেষ্টা।

প্রস্তাবনা শেষ হয়েছে এখন প্রকৃতির বিশেষ কাণ্ডটি বলি। আষাঢ় মাসের শেষ দিকের কথা। লবণদহে প্রচুর পানি। থেমে থেমে বৃষ্টি হচ্ছে। বজরার মাঝিকে বললাম, জল-বিলাসকে সুবিধাজনক কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে। আজ রাতে বজরায় নিশি যাপন করব। একটা পর্যায়ে বাতি নিভিয়ে শরৎচন্দ্রের মতো আঁধারের রূপ দেখব।

মাঝিরা তাই করল। লবণদহের মাঝামাঝি বজরা নিয়ে খুঁটি গাড়ল। আমি বাতি নিভিয়ে দিলাম। এক সময় প্রবল বৃষ্টি শুরু হলো। সঙ্গে বাতাসও আছে। নৌকা দুলছে। আমার ভয় ভয় করতে লাগল। আমি বললাম, রাতে ডাকাত ধরবে না তো?

মাঝি বলল, স্যার ধরতেও পারে। এই হাওরে পেরায়ই ডাকাতি হয়।

প্রায়ই ডাকাতি হয় তাহলে এখানে বজরা এনেছ কেন?

আপনে বলছেন বইল্যা আনছি। নিজ ইচ্ছায় আনি নাই।

আমি বললাম, বজরা ফিরিয়ে নিয়ে চলো। নুহাশ পল্লীর কাছে নিয়ে খুঁটি পোঁত। ডাকাতের হাতে পড়া কোনো কাজের কথা না।

ইঞ্জিনের বজরা। ইঞ্জিনে বাতাস ঢুকেছে বলে স্টার্ট নিচ্ছে না। শেষটায় মাঝিরা লগি এবং বৈঠা নিয়ে যাত্রা শুরু করল। সাপে বরের মতো হলো। ইঞ্জিনের বিকট আওয়াজ থেকে মুক্তি। জল-বিলাসের ছাদে বৃষ্টি পড়ছে।

অপূর্ব সঙ্গীতের মতো শুনাচ্ছে। আমি গায়ে চাদর দিয়ে বসে আছি। বৃষ্টি সঙ্গীত শুনছি। আমার সামনে কাগজ-কলম। বজরার ভেতর দুটা হারিকেন জ্বলছে। অন্য রকম পরিবেশ হয়তো আমার মধ্যেই ঘোরের মতো তৈরি করল। আমি একটা গান লিখে ফেললাম। এর অনেক দিন পর শাওন গানটি রেকর্ড করেছে। গানটি উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না–

যদি মন কাঁদে তুমি চলে এসো এক বরষায়
এসো ঝর ঝর বৃষ্টিতে
জল ভরা দৃষ্টিতে... (ইত্যাদি)

গান রচনা শেষ করে কখন বিছানায় শুয়েছি আর কখন ঘুমিয়ে পড়েছি কিছুই মনে নেই। ঘুমের মধ্যে অদ্ভুত এক স্বপ্ন দেখলাম। স্বপ্নে সব কিছু বদলে যায়। বজরাটা বদলে গেল। আমি দেখলাম অতি আধুনিক একটা স্টিলবডির জলযানে আমি বসে আছি। জলযান তীব্র গতিতে ছুটছে। আমার পাশে ছয়-সাত বছরের একটি বালিকা। আমাদের দুজনের গায়েই লাইফ জ্যাকেট বাঁধা। আমাদের সামনে বসে আছেন নলিনী বাবু। তার পরনেও লাইফ জ্যাকেট। নলিনী বাবুর হাতে একতাড়া কাগজ। আমাদের জলযান (বড় স্পিডবোটের মতো। স্পিডবোট চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এক বিদেশি। তার চোখে কালো চশমা। লাল হাফপ্যান্ট পরা। খালি গা।)

দৃশ্য রাতের না। দিনের। যতদূর চোখ যায় ঘন নীল জলরাশি। আমার পাশে বসা বাচ্চা মেয়েটির হাতে পেনসিল। সে পেনসিল দিয়ে ছবি আঁকছে। আমি মেয়েটিকে চিনতে পারছি না।

মেয়েটি আমার দিকে তাকিয়ে বলল, বাবা! আমি মার কাছে যাব।

মেয়েটি আমাকে বাবা কেন ডাকছে বুঝতে পারছি না। অতি রূপবতী এই বালিকা আমার অপরিচিত। নলিনী বাবু বললেন, মা আমরা তোমার মার কাছেই যাচ্ছি।

মেয়েটি বলল, তুমি কথা বলবে না। আমি পেনসিল দিয়ে তোমাকে খোঁচা দেব।

নলিনী বাবু বললেন, আমাকে কেন খোঁচা দিবে?

মেয়েটি বলল, পেনসিল দিয়ে খোঁচা দিতে আমার ভালো লাগে।

স্বপ্ন দৃশ্য ছাড়াছাড়া হয়। আমি যা দেখছি তা ছাড়াছাড়া কিছু না। মানুষ তার স্মৃতিতে সঞ্চিত জিনিসই স্বপ্নে দেখে এবং স্বপ্ন হয় সাদা-কালো। আমি রঙিন স্বপ্ন দেখছি এবং আমার স্মৃতিতে বাচ্চা মেয়েটি অবশ্যই নেই। তাকে আমি আগে কখনো দেখিনি।

নলিনী বাবু বললেন, আমি আপনার জন্যে কিছু কাগজপত্র নিয়ে এসেছি। আমি অন্য ভুবন থেকে এসেছি। আমি আপনার পরিচিত নলিনী বাবু B.Sc না। আমি পার্টিক্যাল ফিজিক্সে Ph.D করেছি। কিছু কাগজপত্র আমি আপনাকে দেব। আপনি কাগজপত্রগুলি শার্টের ভেতর ঢুকিয়ে রাখবেন। যাতে এগুলি থেকে যায়। বুঝতে পারছেন?

আমি বললাম, না। কিছুই বুঝতে পারছি না। শুধু আমি একটা বিচিত্র স্বপ্ন দেখছি এটা বুঝতে পারছি।

নলিনী বাবু বললেন, আপনি স্বপ্ন দেখছেন না। আমি প্যারালাল ওয়ার্ল্ড থেকে এসেছি। দু'টা জিনিস আপনাকে বুঝাব। একটা হলো Borromeen ring. তিনটা রিং একত্র করা। এটা হলো টপলজিক্যাল একটা গিট্টু। একটা রিং খুললেই তিনটা আলাদা হয়ে যাবে।

আরেকটা হচ্ছে Hopf ring. এর একটা খুললে দু'টা আটকে থাকবে। আলাদা হবে না। বুঝতে পারছেন? আমি এঁকে দেখাচ্ছি। খুকি তোমার পেনসিলটা দাও।

বাচ্চা মেয়েটা বলল, আমি পেনসিল দিব না। আমি পেনসিল দিয়ে খোঁচা দেব।

নলিনী বাবু বললেন, আপনি কাগজগুলি রাখুন। এখানে entanglement সম্পর্কে সুন্দর করে বলা আছে। সহজ কথায় entanglement হচ্ছে দু'টি Particle-এর মাঝখানের দূরত্ব এক মিলিয়ন বা এক বিলিয়ন মাইল হলেও এরা অতি রহস্যময়ভাবে একে-অন্যের সঙ্গে যুক্ত। একটির কোনো পরিবর্তন হলে সঙ্গে সঙ্গে অন্যটিরও পরিবর্তন হবে। আমি মূলত স্পিন পরিবর্তনের কথা বলছি। হাতে সময় নেই। কাগজগুলি রাখুন।

আমি কাগজ হাতে নিলাম।

শার্টের ভেতর কাগজগুলি ঢুকিয়ে চাদর মুড়ি দিন। এবার কুকুর কুণ্ডলী হয়ে শুয়ে থাকুন, যেন কাগজ চলে না যায়।

আমি তাই করলাম আর তখনই বিকট বজ্রপাতে ঘুম ভাঙল। জেগে উঠে দেখি আমি বজরায় আমার ঘরে শুয়ে আছি। বজরা নুহাশ পল্লী ঘাটে বাঁধা। মাঝি বলল, স্যার কি জাগনা?

আমি বললাম, হ্যাঁ।

ঠাডা কেমন পড়ছে দেখছেন। আরেকটু হইলে বজরায় ঠাডা পড়ত। পুইড়া কইলা হইতাম।

আমি বললাম, চা করো। চা খাব। চা খেয়ে নুহাশ পল্লীতে চলে যাব। বজরায় থাকব না। ||মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক||

মাঝি চা বানাচ্ছে। আমি স্বপ্ন নিয়ে ভাবছি। স্বপ্ন হচ্ছে Short time memory. কিছুক্ষণের মধ্যেই স্বপ্নে কি দেখেছি তা ভুলে যাব। আমার উচিত স্বপ্নের সব খুঁটিনাটি লিখে ফেলা। লিখতে ইচ্ছ করছে না। স্বপ্নে একগাদা কাগজ বুকের ভেতর নিয়ে শুয়েছিলাম। জেগে কোনো কাগজ পেলাম না। পাওয়ার কথাও না। কাগজ খুঁজেছি এটাই হাস্যকর।

স্বপ্নের একটা ব্যাখ্যা আমি দাঁড়া করলাম। নর্থ ডাকোটা বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন Ph.D করি তখন আমার সহপাঠী রালফ নামের এক আমেরিকান ছাত্রের সঙ্গে পালতোলা নৌকা ভ্রমণে গিয়েছিলাম। তার সঙ্গে ছিল তার স্ত্রী এবং বাচ্চা একটা মেয়ে। আমেরিকান পালতোলা নৌকা বাতাস পেলে তীব্র গতিতে ছুটে। ঘন নীল পানিতে আমরা ছুটছিলাম তীব্র গতিতে। আমাদের সবার গায়ে লাইফ জ্যাকেট ছিল। রালফ নৌকার পাল ধরেছিল, সে ছিল খালি গায়। তার পরনে ছিল লাল প্যান্ট।

আমার স্বপ্নে দেখা জলযান রালফের পালতোলা নৌকা। এবং বাচ্চা মেয়েটি হচ্ছে রালফের মেয়ে। বাচ্চা মেয়েটিকে দেখে আমার হয়তো মনে হয়েছিল, ইশ এ রকম একটা রূপবতী কন্যা যদি আমার থাকত! প্রকৃতি দীর্ঘদিন পর স্বপ্নের মাধ্যমে আমার ইচ্ছা পূরণ করেছে।

নলিনী বাবুর ব্যাপারটা শুধু পরিষ্কার হচ্ছে না। হয়তো অবচেতন মনে তিনি আছেন বলেই স্বপ্নে ধরা দিয়েছেন।

আমি বিজ্ঞানের বই সময় পেলেই পড়ি। কোয়ান্টাম মেকানিক্স আমার প্রিয় বিষয়। 'Entenglement' নিশ্চয়ই সেখান থেকেই আছে।

স্বপ্নের ব্যাপারটা পুরোপুরি যুক্তির ভিতর নিয়ে আসার পরেও নলিনী বাবু গলায় মাছের কাঁটার মতোই অস্বস্তি নিয়ে বিঁধে রইল। আমি এক সন্ধ্যাবেলা ঠিক করলাম নলিনী বাবুর খোঁজে বের হব। নীলগঞ্জ যাব।

মিসির আলী নামে আমার একটা চরিত্র আছে। এই মিসির আলি সব সমস্যা যুক্তি দিয়ে সমাধান করার চেষ্টা করেন। সমস্যা সমাধানের জন্যে হেন জায়গা নেই যেখানে সে যায় না। বাস্তবে মিসির আলির অস্তিত্ব থাকলে সে এই কাজটাই করত। অবশ্যই নীলগঞ্জে যেত। এক অর্থে আমিই তো মিসির আলি। আমি কেন যাব না? সমস্যা হচ্ছে আমি একা কোথাও যেতে পারিনি। যে কোনো যাত্রায় আমার সঙ্গী লাগে। সঙ্গী জোগাড় করতে পারছিলাম না। সবাই ব্যস্ত। আমার মতো অবসরে কেউ নেই। মাসখানেক পার হওয়ার পর সালেহ চৌধুরী (সহ-সম্পাদক, দৈনিক বাংলা) রাজি হলেন। আমরা মাইক্রোবাসে করে রওনা হলাম।

মাইক্রোবাস যাচ্ছে, কিন্তু যাচ্ছেটা কোথায়? আমার কাছে কোনো ঠিকানা নেই। নলিনী বাবুর কাছ থেকে জানি তাঁর স্কুলের নাম নীলগঞ্জ গার্লস হাই স্কুল। তাঁর বাবা শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য ময়মনসিংহ থেকে নীলগঞ্জ আসতেন কাজেই জায়গাটা ময়মনসিংহ জেলায়।

আমি মিসির আলির মতো মাথা খাটালাম। ময়মনসিংহ জেলা শিক্ষা অফিসারের কাছে জানতে চাইলাম নীলগঞ্জ গার্লস হাই স্কুল কোথায়? তিনি সঙ্গে সঙ্গে ঠিকানা দিলেন।

সালেহ চৌধুরী বললেন, তোমার ভালো বুদ্ধি। এইভাবে ঠিকানা বের করার কথা আমার মাথায় আসে নাই।

আমি বললাম, আমার বুদ্ধি মিসির আলির চেয়েও বেশি।

সালেহ চৌধুরী বললেন, না তা হবে না। মিসির আলি সাহেবের এ্যানালাইটিক্যাল রিজনিং অসাধারণ।

আমি এই ভেবে আনন্দ পেলাম যে সালেহ চৌধুরী মিসির আলিকে উপন্যাসের চরিত্র হিসেবে দেখছেন না। অতি বুদ্ধিমান মানুষও মাঝে মাঝে বাস্তব-অবাস্তব সীমারেখা মনে রাখতে পারেন না।

নীলগঞ্জ গার্লস হাই স্কুলে উপস্থিত হলাম ঠিকই কিন্তু নলিনী বাবুকে পেলাম না। তিনি অসুস্থ। কোনো এক মানসিক রোগীদের ক্লিনিকে চিকিৎসাধীন। ক্লিনিকটা কোথায় পরিষ্কার করে কেউ বলতে পারল না। হেডমাস্টার সাহেব বললেন, খুব সম্ভব চিটাগাংয়ে। নলিনী বাবুর এক আত্মীয় ডাক্তার। তিনি থাকেন চিটাগাংয়ে। নলিনী বাবু অসুস্থ হলে তিনিই চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন।

নীলগঞ্জ হাইস্কুলের ধর্মশিক্ষক বললেন, ক্লিনিকটা ঢাকায়। তিনি নাকি একবার কথায় কথায় জেনেছেন। হেডমাস্টার সাহেবের সঙ্গে কথাবার্তা যা হলো, তা এ রকম–

আমি : নলিনী বাবুর বাবা সম্পর্কে কি জানেন? শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য।

হেডমাস্টার : উনি মারা গেছেন।

আমি : মানুষ কেমন ছিলেন?

হেডমাস্টার : মৃত ব্যক্তির দোষ-ত্রুটি নিয়ে আলাপ শোভন না। উনার কিছু দোষ-ত্রুটি ছিল। তবে নলিনী বাবু সর্বদোষমুক্ত মানুষ।

আমি : নলিনী বাবু সম্পর্কে বলুন।

হেডমাস্টার : বললাম না, উনি সর্বদোষমুক্ত মানুষ।

আমি : উনার অসুখ বিষয়ে বলুন।

হেডমাস্টার : মৃগী রোগ ছিল। মাথা খারাপের কিছু লক্ষণও ছিল।

আমি : নলিনী বাবুর বিশেষ কোনো কিছু কি আপনার চোখে পড়েছে?

হেডমাস্টার : না।

আমি : মাথা খারাপের কি লক্ষণ ছিল?

হেড মাস্টার : স্মরণে আসতেছে না।

আমি : তিনি অদ্ভুত কিছু দেখেন এইসব কখনো বলতেন?

হেড মাস্টার : শিক্ষার বাইরে অন্য আলাপ আমার স্কুলে নিষিদ্ধ। কারণ শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। আমাদের নবিজি বলেছেন, শিক্ষার প্রয়োজনে সুদূর চীন দেশে যাও।

গ্রামের মানুষরা এমনিতে প্রচুর কথা বলে। বিপত্তি তখনই হয় যখন কথাবার্তার সময় একটা রেকর্ডিং ডিভাইস সামনে থাকে। হেডমাস্টার সাহেবের চোখ-মুখ শক্ত। তিনি একদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন তার সামনে রাখা ক্যাসেট রেকর্ডারের দিকে। আমি ক্যাসেট রেকর্ডার সরিয়ে দিলাম, তাতেও লাভ হলো না।

আমি তাঁকে আশ্বস্ত করার জন্য তাঁর হাত ধরে কোমল গলায় বললাম, হেড মাস্টার সাহেব, আপনার কাছে নলিনী বাবুর কোনো অস্বাভাবিকতা ধরা পড়েনি?

জি না।

হেকিম নামে কোনো কাঠমিস্ত্রিকে চেনেন? নলিনী বাবু বলেছিলেন সে খুব ভালো কাঠমিস্ত্রি। নলিনী বাবু তাকে দিয়ে আমার জন্যে একটা ইজি চেয়ার বানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন।

হেকিম নামে আমি কাউকে চিনি না। আপনি ছোট বাজারে খোঁজ নেন।

ছোট বাজার বড় বাজার সব বাজারেই গেলাম। হেকিম নামে কোনো কাঠমিস্ত্রির সন্ধান পাওয়া গেল না। সন্ধান পেলে তার কাছ থেকে কিছু জানা যেত।

সুলতানা বেগম নামে দশম শ্রেণী খ শাখা বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্রীটির খোঁজ করার চেষ্টা করলাম। সে নীলগঞ্জে নেই। তার বিয়ে হয়ে গেছে। সে স্বামীর সঙ্গে আছে। স্বামী খুলনার মংলা পোর্টে আছে।

সুলতানার ছোট বোনের নাম আফসানা। আমি তার কাছেও গেলাম। আমাকে দেখে কোনো কারণ ছাড়াই ভয়ে অস্থির হয়ে গেল। আমি বললাম, আফসানা তুমি কি আমাকে চেনো?

আফসানা বলল, আমি আপনাকে চিনি না। আমি গল্পের বই পড়ি না।

আমি বললাম, তুমি যে আমাকে চেনো না বললে এটা ঠিক না। তুমি বলেছ তুমি গল্পের বই পড়ো না। যে আমাকে চেনে না তার জানার কথা না যে আমি গল্প লিখি। এখন বলো তুমি কি নলিনী বাবুকে চেনো? না-কি তাকেও চিনো না?

আফসানা মুখ শক্ত করে দাঁড়িয়ে রইল। আমি বললাম, নলিনী বাবু কি তোমাদের বাড়িতে কখনো এসেছেন। তোমার বড় আপার কাছ থেকে গল্পের বই নিতে বা বই ফিরত দিতে?

আফসানা বলল, কোনোদিন আসেন নাই। কেউ যদি এই কথা বলে সে শত্রুতা করে বলেছে।

আফসানার সঙ্গে আর কথা বলা বৃথা। আমি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালাম।

নলিনী বাবু বিষয়ে আমি কোনো নতুন তথ্যই পেলাম না। তার বাড়ি দেখতে গেলাম। বাড়ি একজন কেয়ারটেকার দেখাশোনা করে, তার নাম রামচন্দ্র। সে খুব আগ্রহ নিয়ে তালা খুলে বাড়িঘর দেখাল। তার অতিরিক্ত আগ্রহের কারণ আমার কাছে স্পষ্ট হলো না। একটু পরপর বলছে, রাতে একটু সেবা নিবেন। সেবা নেওয়ার অর্থ যে রাতে ডিনার করতে হবে তা বুঝতেও অনেক সময় লাগল।

নলিনী বাবুর বাড়িতে রাতে 'সেবা' নিলাম। সেবা না নিলেই ভালো হতো। তার প্রতিটি খাবারই অখাদ্য। মুরগি রান্না করেছে। লবণ যতটুকু

প্রয়োজন তার তিনগুণ দিয়েছে। অতিরিক্ত লবণ সে পুষিয়ে দিয়েছে ডাল এবং সবজিতে। সেখানে একেবারেই লবণ নেই।

রাতেই ঢাকায় ফিরে যেতে চাচ্ছিলাম, মাইক্রোবাসের ড্রাইভার বলল, গাড়ির চাকা পাংচার হয়েছে। স্পেয়ার চাকায় হাওয়া নাই। নেত্রকোনা থেকে চাকা ঠিক করিয়ে আনতে হবে।

বাধ্য হয়ে নলিনী বাবুর বাড়িতেই রাত্রি যাপনের সিদ্ধান্ত নিলাম। রামচন্দ্রকে খুবই আহ্লাদিত মনে হলো।

রামচন্দ্র পান নিয়ে এসেছে। আমি পান চিবাচ্ছি, সিগারেট টানছি। রাতের কুৎসিত খাবারের দুঃখ ভুলার চেষ্টা করছি তখন রামচন্দ্র ভয়ঙ্কর এক গল্প ফাঁদল। আমার শরীর কেঁপে উঠল। একবার নলিনী বাবুর বাবা তার শিশুপুত্রকে শায়েস্তা করার জন্য কুয়ার ভেতর ফেলে দিয়েছিলেন। অনেক ঝামেলা করে তাকে কুয়া থেকে উদ্ধার করা হয়।

আমি বললাম, তখন নলিনী বাবুর বয়স কত?

চার-পাঁচ বছর। এরপরই তার মধ্যে মৃগী রোগের লক্ষণ দেখা যায়।

তুমি কতদিন এই বাড়িতে আছ?

দিনের হিসাব তো করি নাই। মেলা দিন ধইরা আছি। ত্রিশ-চল্লিশ বছর হইতে পারে। আমার স্ত্রী-পরিবার সব ইন্ডিয়াতে চলে গেছে। আমি পইরে আছি।

কেন?

বাড়িটার উপরে মায়া চইলা আসছে এইজন্যে। মায়া কঠিন জিনিস। এই বাড়ির কুয়াতে ভূত আছে। ভূতের জন্যে মায়া।

সালেহ চৌধুরী বললেন, ভূতের জন্য মায়া মানে কী?

রামচন্দ্র জানালো দীর্ঘদিন কোনো পশু-পাখির সঙ্গে বাস করলে তার জন্যে মায়া জন্মে। একইভাবে দীর্ঘদিন কোনো ভূতের সঙ্গে বাস করলে ভূতের প্রতি মায়া জন্মে।

আমি বললাম, ভূতটা কুয়ায় বাস করে?

রামচন্দ্র বলল, হুঁ। স্যারের স্ত্রী কুয়াতে ঝাঁপ দিয়া পইড়া মারা গেছিলেন। তারপর থাইকা ভূত হইয়া কুয়ায় বাস করেন।

আমি বললাম, নলিনী বাবু আমাকে বলেছিলেন, তার মা ফাঁস নিয়ে মারা যান।

রামচন্দ্র বলল, ছোট স্যার পেরায়ই উল্টাপাল্টা কথা বলেন। আমারে পেরায়ই ডাকেন বড় মামা। আমি তো উনার মামা না। আপনারা কি ভূতের আলামত কিছু দেখতে চান?

কী আলামত দেখাবে?

কুয়াতলায় বইসা থাকবেন, রাইত গভীর হইলে শুনবেন, কুয়ার ভিতরে কেউ সাঁতার কাটতাছে। ভাগ্য ভালো থাকলে তার কথা শুনবেন।

তুমি শুনেছ?

অনেকবার শুনেছি। ছোট স্যার যখন চিকিৎসার জন্যে ঢাকা যায়, তখন কুয়ার পাড়ে আমি যতবার বসছি, ততবারই উনার কথা শুনেছি।

কী কথা?

উনি বলেন, ও চন্দ্র! আমার ছেলে কই? তাকে একলা কেন ছাড়লি। তুই কেন সাথে গেলি না?

তোমাকে চন্দ্র ডাকে? রামচন্দ্র ডাকে না?

ভূত মুখে রামনাম নিতে পারে না। এই জন্য চন্দ্র ডাকে।

এক সমস্যা জানতে এসে আমরা ভূত সমস্যায় জড়িয়ে পড়লাম। কুয়ার পাড়ে বসে ভূতের কথা শোনার অভিজ্ঞতা থেকে নিজেকে বঞ্চিত করার অর্থ হয় না। সঙ্গে ক্যাসেট রেকর্ডার আছে। রেকর্ডার চালু থাকবে। ভূত কোনো কথা বললে রেকর্ড হয়ে যাবে। বন্ধু-বান্ধবদের ভূতের গল্প শোনানোর সময় ভূতের কণ্ঠস্বর শুনিয়ে দেব।

কুয়াতলাটা সুন্দর। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একটু দূরে প্রকাণ্ড কাঁঠাল গাছ। গাছের ডালপালা কুয়ার ওপর পর্যন্ত চলে এসেছে। আমি এবং সালেহ চৌধুরী কুয়ায় হেলান দিয়ে বসেছি। পঞ্চমীর চাঁদের আলো কাঁঠাল গাছের পাতা ভেদ করে আমাদের গায়ে পড়ে অদ্ভুত সব নকশা তৈরি করছে। দূরে কোথাও কামিনী ফুলের ঝাঁক আছে। বাতাসে মাঝে মাঝে ফুলের সৌরভ ভেসে আসছে। সারাক্ষণ এই গন্ধ নাকে লাগলে ভালো লাগত না। মাঝে মাঝে গন্ধ পাচ্ছি বলে ভালো লাগছে।

আমরা কেউ কোনো কথা বলছি না। কারণ, ক্যাসেট প্লেয়ার চালু আছে। ভূতের কণ্ঠস্বর রেকর্ড করা হবে।

সালেহ চৌধুরীর সমস্যা হচ্ছে (আমি তাকে নানাজি ডাকি), তিনি বেশিক্ষণ কথা না বলে থাকতে পারেন না। কোনো না কোনো প্রসঙ্গে তার কথা বলতেই হবে। পাঁচ মিনিট পার হওয়ার আগেই তিনি বললেন, টিউবওয়েল আসার পর কুয়া উঠে গেছে। কুয়াতলা সুন্দর একটা জায়গা। টিউবওয়েলতলা বলে কিছু নেই।

আমি বললাম, নানাজি চুপ করে থাকুন। ভৌতিক কণ্ঠস্বর রেকর্ড হবে।

তিনি মিনিট দুই চুপ করে থেকে বললেন, কুয়াতে বালতি পড়ে গেলে আঁকশি নামের এক বস্তু দিয়ে তোলা হতো। তুমি আঁকশি দেখেছ?

আমি বললাম, আঁকশি দেখেছি। আপনি চুপচাপ বসে সিগারেট খান।

তিনি সিগারেট ধরালেন। সিগারেট শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ করে থেকে নিজেই এক জ্বিন নামানোর গল্প শুরু করলেন। এই গল্প থেকে তাকে আর আটকানো গেল না। নানান শাখা-প্রশাখা বিস্তার করে গল্প চলতেই থাকল। জিন থেকে কিভাবে কিভাবে মুক্তিযুদ্ধের গল্পে চলে এলেন। যুদ্ধ করতে গিয়ে কি বিপদে পড়েছেন, মিলিটারির তাড়া খেয়ে কিভাবে ঝাঁপ দিয়ে নদীতে পড়েছেন। এইসব গল্প শুরু হয়ে গেল। আমি জানি এখন আর তাঁকে থামানো যাবে না। হতাশ হয়ে ক্যাসেট প্লেয়ার বন্ধ করে দিলাম।

নীলগঞ্জ থেকে খালি হাতেই ফেরার কথা ছিল। খালি হাতে ফিরলাম না। হলুদ প্লাস্টিকের মলাট দেয়া একটা ডায়েরি নিয়ে ফিরলাম। ডায়েরি পাবার গল্প করা যেতে পারে।

রাতে আমাদের দু'জনের থাকার জায়গা হলো দোতলা ঘরে। প্রাচীন আমলের বড় কালো রঙের খাটে দু'জনের শোবার ব্যবস্থা। রামচন্দ্র সব গুছিয়ে রেখেছে। ধোয়া চাদর, পরিষ্কার বালিশ, কোল বালিশ। নানাজি বললেন, ভালো ব্যবস্থা। আরাম করে ঘুম দেয়া যাবে। কিন্তু তিনি ঘুমের দিকে মোটেই গেলেন না। আয়োজন করে মুক্তিযুদ্ধের এক অপারেশনের গল্প শুরু করলেন। এই গল্প আগেও কয়েকবার শুনেছি। একবার যখন শুরু হয়েছে আবারও শুনতে হবে। উদ্ধার পাবার পথ দেখছি না। নানাজি যখন গল্পের এক ফাঁকে রামচন্দ্রকে বললেন, ফ্লাস্কে করে চা দেয়া যাবে? তখন আমি পুরোপুরি হতাশ হয়ে গেলাম। পরিষ্কার বুঝতে পারছি নানাজি দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় যাচ্ছেন।

আমাকে উদ্ধার করল রামচন্দ্র। সে ফ্লাস্ক ভর্তি চা নিয়ে এসে বলল, আমি যে ঘরে আগে ঘুমাইতাম সেইখানে একটা পেততুনি থাকে। এই কারণে দোতলায় আর থাকি না।

আমি নানাজিকে বললাম, পেততুনি যে ঘরে থাকে সেই ঘরটা একটু দেখে আসি। তারপর আপনার গল্পের বাকিটা শুনব।

নানাজি বললেন, পেততুনির ঘর দেখার কি আছে?

আমি বললাম, যাব আর আসব। আপনি সিগারেট ধরান। আপনার সিগারেট শেষ হবার আগেই আমি উদয় হব।

পেততুনির ঘর দোতলার শেষ মাথায়। গুদাম ঘর টাইপ। দুনিয়ার জিনিসপত্রে ঠাসা। কোনোমতে একটা চৌকি বসানো। চৌকির উপর পাটি বিছানো। পাটির উপর ঢাকনা দেয়া মটকি। সেখান থেকে মিষ্টি গন্ধ আসছে। বেশ বড়সড় আলমারি আছে। যার বেশিরভাগ কাচই ভাঙা। ভাঙা কাচের ভেতর দিয়ে কিছু বইপত্র দেখা যাচ্ছে। পঞ্জিকা, রামায়ণ, গীতাভাষ্য ধরনের বই। একটি বাড়িতে কি ধরনের বই পাঠ করা হয় তা থেকে বাড়ির বাসিন্দাদের মানসিকতা আঁচ করা যায়। আমি হারিকেন হাতে বইয়ের সংগ্রহের দিকে এগিয়ে গেলাম। রামচন্দ্র ধারা বর্ণনার মতো পেততুনি বিষয়ে বলে যেতে লাগল।

স্যার পেততুনি কি জানেন?

না।

অল্পবয়েসি মেয়ে ভূত। মেয়ে ছেলের যত বদমাইশি থাকে এরারও তাই থাকে। এই যে মুটকি দেখতেছেন, এর ভিতরে আছে 'রসা'। রসা বুঝেন স্যার? খেজুর গুড়ের রস। পেততুনিটা রোজ রাইতে আইসা রসা খায়। খায় আর খিকখিক কইরা হাসে।

রামচন্দ্র বকরবকর করে যাচ্ছে আর আমি বই ঘাঁটছি। তখনই হলুদ মলাটের একটা ডায়েরি পাওয়া গেল। পুরোটাই ইংরেজিতে লেখা। মাঝে মাঝে বাংলায় নোট। ডায়েরির প্রথম পাতায় বড় বড় করে লেখা– Dream Analogy. লেখক N. Vattacharya.

এই N. Vattacharyaই কি আমাদের নলিনী বাবু? আমি রামচন্দ্র এই ডায়েরিটা কি নলিনী বাবুর?

জানি না স্যার। তারপর শুনেন ঘটনা, এক রাইতের ঘটনা শুনেন। আমি শুইয়া আছি, হঠাৎ বুঝলাম কেউ একজন আমার পায়ে হাত দিছে। ঠাণ্ডা হাত। চিকন আঙ্গুল। আমি তো চমকায় উঠলাম। বুঝছি পেত্তুনির খেলা। এখন করব কি ভাইব্যা পাইতাছি না। ঝাপটায়া ধরব? ঝাপটায়া ধরলে পেত্তুনি কি করে তাও জানি না। স্যার আমার বিপদ বুঝতেছেন?

আমি রামচন্দ্রের বিপদ বুঝতে না পারলেও নিজের বিপদ পরিষ্কার বুঝতে পারছি। নানাজির সঙ্গে থাকলে সারারাত মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন অপারেশনের গল্প শুনতে হবে। আর রামচন্দ্রের সঙ্গে থাকলে শুনতে হবে পেত্তুনির গল্প। আমাকে ঠিক করতে হবে আমি কি শুনতে চাই।

ব্যক্তিগত ডায়েরির প্রতি আমার আকর্ষণ আছে। তবে সেই সব ডায়েরি যা একদিন প্রকাশিত হবে ভেবে লেখা হয়নি। যেমন আনা ফ্রাংকের ডায়েরি।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ের কথা নিয়ে অনেক লেখকের ব্যক্তিগত ডায়েরি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিটি আমি মন দিয়ে পড়েছি। অনেক বার ধাক্কার মতো খেয়েছি। ডায়েরি পড়তে গিয়েই বুঝেছি বিষয়টা বানানো। একটা উদাহরণ দিয়ে পরিষ্কার করছি।

> "আজ '...' তারিখ। বৃহস্পতিবার। বাসায় গরুর মাংস রান্না হয়েছে। আমার মন বিক্ষিপ্ত বলে না খেয়ে শুয়ে আছি। রেডিও পাকিস্তানে ইয়াহিয়ার ভাষণ শুনে মন আরো খারাপ হলো। মন ঠিক করার জন্য ডায়েরি লিখতে বসেছি। কি লিখলে মন ভালো হবে তাও বুঝতে পারছি না।"

এইটুকু পড়ে কি করে বুঝলাম বানানো? কারণ ঐ তারিখে ইয়াহিয়া খান বেতারে কোনো ভাষণ দেননি। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটা উপন্যাস লেখার কারণ আমি প্রতিদিনকার ঘটনা আলাদা করেছি।

এন ভট্যাচারিয়ার ডায়েরিতে ফিরে যাই। এন যে নলিনী বাবু তা বোঝা যাচ্ছে। ডায়েরির লেখাগুলি অত্যন্ত গোছানো। বেশিরভাগ ইংরেজি ভাষায় লেখা। আমি ভাষান্তর করেছি। প্রতিটি লেখার আলাদা শিরোনাম আছে। যেমন–

মুদ্রিত স্মৃতি
(Imprint memory)

কিছু স্মৃতি মস্তিষ্কে জন্মের পর পর তৈরি হয়। আগে থাকে না। হাঁসের বাচ্চার মুদ্রিত স্মৃতি হচ্ছে– 'চলমান বস্তুটি তোমার মা'। জন্মের পর পর

হাঁসের বাচ্চা চলমান কিছু দেখলেই তাকে মা মনে করে। তার পেছনে পেছনে চলতে থাকে।

অস্ট্রিয়ান জীববিজ্ঞানী কোনরাড লরেঞ্জ এই নিয়ে চমৎকার একটি পরীক্ষা করেন। ডিম থেকে বাচ্চা বের হবার পর পর তিনি চলমান বস্তু হিসেবে নিজেই আবির্ভূত হলেন। তিনি যেখানে যান, হাঁসের বাচ্চারা তাঁর পেছনে পেছনে যায়। তিনি পানিতে নামলে হাঁসের বাচ্চারাও তাঁর সঙ্গে পানিতে নামে। লরেঞ্জ তখন হাঁসের বাচ্চাদের মা'কে উপস্থিত করলেন। বাচ্চারা ফিরেও তাকাল না। তারা লরেঞ্জের পেছনে পেছনেই ঘুরতে থাকল।

টীকা

প্রকৃতি হাঁসের বাচ্চাদের চলমান বস্তুকেই মা ভাবতে শিখিয়েছে কারণ হাঁস নিজে তা দিয়ে ডিম ফুটায় না। মুরগিকে এই কাজটা করতে হয়।

ডায়েরি পড়ে আমি নিজে খানিকটা চমকালাম কারণ আমি নিজেও জানতাম না যে হাঁস ডিমে তা দেয় না। হাঁসও যে কোকিলের মতো তা জানা ছিল না। নাগরিক লেখকরা গ্রামবাংলার অনেক সাধারণ তথ্যই জানেন না।

ডায়েরির লেখক স্মৃতি বিষয়েই লিখে গেছেন। আরেকটা উদাহরণ দেই।

সহজাত স্মৃতি

পাখিকে বাসা তৈরি করতে শেখাতে হয় না। মাকড়সাকে জাল বুনতে শেখাতে হয় না। এইমাত্র ডিম ফুটে বের হয়েছে মুরগির ছানারা তাদের গায়ে বা আশেপাশে উড়ন্ত শিকারি চিলের ছায়া দেখলে ভয়ে চেঁচাতে থাকে। অথচ তাদেরকে কেউ শিখিয়ে দেয়নি শিকারি চিলের ছায়া কেমন।

টীকা-১

অতি উন্নত মস্তিষ্ক হলো মানব মস্তিষ্ক। এই মস্তিষ্কের কি সহজাত বা মুদ্রিত স্মৃতি আছে? আমার ধারণা

নেই। মানুষের সব স্মৃতিই অর্জিত স্মৃতি। নিম্নশ্রেণীর প্রাণের জন্য প্রকৃতি সহজাত এবং মুদ্রিত স্মৃতির প্রয়োজন বোধ করেছে। উচ্চশ্রেণীর প্রাণের জন্য নয়।

টীকা–২

Johanes Schmidt

এই বিজ্ঞানী ইল মাছের সহজাত স্মৃতি প্রথম আবিষ্কার করেন। ইল মাছ, মিঠাপানির মাছ। নদীতে থাকে। ডিম পাড়ার সময় গভীর সমুদ্রে চলে যায়। বারমুদা দ্বীপের কাছে শৈবাল সাগরে (Sargasso Sea) সেখানেই ডিম পড়ে। ডিম পাড়ার পর পরই তারা মারা যায়। ডিম ফুটে যখন বাচ্চা বের হয় তখন তারা সমুদ্রে ভেসে উঠে এগিয়ে যেতে থাকে উত্তর দিকে। কিছু দূর যাবার পর ওরা দু'দলে ভাগ হয়ে যায়। একদল যেতে থাকে উত্তর আমেরিকা থেকে কারণ তাদের মায়েরা এসেছিল উত্তর আমেরিকা থেকে। আরেক দল যেতে থাকে ইউরোপের দিকে। কারণ তাদের মায়েরা এসেছিল ইউরোপ থেকে। তারা নদী-নালায় বড় হতে থাকে। ডিম পাড়ার সময় হলে আবারও হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে শৈবাল সাগরের দিকে যাত্রা।

ডায়েরি লেখকের মূল লেখক স্মৃতি বিষয়ে। RNA স্মৃতির কেরিয়ার কি-না সে বিষয়ে নানান কথা। এবং বেশ জটিল কথা।

কয়েক জায়গায় দেখলাম ভবিষ্যদ্বক্তা নস্ট্রাডেমাসের নাম। ইনি পাঁচশ' বছর আগে ফ্রান্সে জন্মেছিলেন। হাজার বছরের পৃথিবীর ভবিষ্যৎ লিখে গেছেন। তাঁর সব ভবিষ্যদ্বাণী ছিল চারপদের কবিতায়। এদের বলা হয় কোয়াট্রেন। কোয়াট্রেনের ভাষা বেশ জটিল এবং রূপকাশ্রয়ী।

নস্ট্রাডেমাসের বেশিরভাগ ভবিষ্যদ্বাণী ফলে গিয়েছে। যেমন তিনি আমেরিকা নামক দেশ আবিষ্কার হবে বলেছেন। এটম বোমার ধ্বংসযজ্ঞের কথা বলেছেন। ফরাসি বিপ্লবের কথা বলেছেন।

ডায়েরিতে নস্ট্রাডেমাসের একটি কোয়াট্রেন দেয়া আছে। তার পাশে বাংলায় লেখা এর অর্থ কি আমি যা ভাবছি তা?

কোয়াট্রেনটা এই–

মানুষ একজন অসংখ্য সে
যেমন এক বৃক্ষ অসংখ্য পত্র
কিছু আলো, কিছু অন্ধকার
প্রাসাদ একটি তার অসংখ্য দোয়ার

আমি ডায়েরির খানিকটা পড়ে নিশ্চিত হলাম এর লেখক আমাদের নলিনী বাবু B.Sc. হতেই পারেন না। এত ব্যাপক পড়াশোনা তাঁর থাকার কোনো কারণ নেই। যিনি সব লেখকের একটি মাত্র বই পড়েন তাঁর পাঠাভ্যাস নেই। গ্রামের একজন স্কুল শিক্ষকের হাতের কাছে বইপত্রও থাকে না।

ডায়েরি নলিনী বাবুর লেখা না অন্য কোনো মানুষের লেখা এই তথ্য যে অতি সহজেই প্রমাণ করা যায় তা আমার মাথায় অনেক দিন আসেনি। আমাদের মস্তিষ্ক রহস্য সমাধানে সহজ পথে যেতে চায় না। মস্তিষ্ক নিজে জটিল বলে খুঁজে জটিল পথ।

আমার কাছে নলিনী বাবুর হাতে লেখা সংস্কৃত শ্লোকের খাতা আছে। খাতার লেখা এবং ডায়েরির বাংলা লেখা মিলিয়ে দেখলেই রহস্যের সমাধান হয়। খাতার লেখা এবং ডায়েরির লেখা মিলিয়ে দেখলাম। হস্তাক্ষর বিশেষজ্ঞ না হয়েও যে কেউ বলবে একই হাতের লেখা। স্কুল শিক্ষক নলিনী বাবুই জটিল সব তথ্য লিখেছেন এবং ডায়েরিতে সংস্কৃতি শ্লোকও আছে। একটাই শ্লোক। জটিল প্রসঙ্গের শেষে শ্লোকটা লেখা–

"ন হি সর্ববিদঃ সর্বে"

আমি সংস্কৃত জানি না বলে এর অর্থ উদ্ধার করতে পারলাম না। মিসির আলি সাহেব নামে বাস্তবে কেউ থাকলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত জানে এমন কারো সঙ্গে যোগাযোগ করতেন। আমি একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায়। অভিনেতা এবং আবৃত্তিকার। অনেক সংস্কৃত শ্লোক উনার মুখস্থ। তিনি হয়তো এই শ্লোকের অর্থ জানবেন। জয়ন্ত চট্টোপাধ্যায় বললেন, জীবনে প্রথম শুনলাম। অর্থ কি জানি না।

ডায়েরি নিয়ে গবেষণার ইতি টানতে হলো। ডায়েরির পেছনে সময় নষ্ট করা কোনো কাজের কথা না। নানান কাজকর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। মাঝে মাঝে নিজের মনেই উচ্চস্বরে বলি 'ন হি সর্ববিদঃ সর্বে'। আশেপাশে কেউ

থাকলে চমকে উঠে বলে, কি বললেন? আমি উত্তরে বলি, কি বলেছি নিজেই জানি না।

সব মানুষের জীবনেই ছোটখাটো বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে। তারা সাময়িকভাবে বিস্মিত হয় কিন্তু অতি দ্রুত ভুলে যায়। আমার জীবনে ছোট একটা বিস্ময়কর ঘটনা ঘটল। আমি নুহাশ পল্লীতে। আষাঢ় মাস। ঝুম বৃষ্টি হচ্ছে। আমি আছি বৃষ্টি বিলাসে। বৃষ্টি বিলাস ঘরের চাল টিনের। টিনের চালে বৃষ্টির শব্দ শোনার জন্য আমি বৃষ্টি বিলাসে এসেছি। প্রশস্ত বারান্দায় বসে আছি। সামনে চায়ের কাপ। কাপে চুমুক দিচ্ছি না কারণ সিগারেট নেই। সিগারেট ধরিয়ে চায়ে চুমুক দেয়া হবে। একজন সিগারেট আনতে গেছে। আমি অভ্যাস মতো হঠাৎ বললাম,

"ন হি সর্ববিদঃ সর্বে"

বিস্ময়কর ঘটনাটি তখন ঘটল। আমার হঠাৎ মনে হলো এই শ্লোকের অর্থ,

"সকলেই সকল বিষয় জানে না।"

আশ্চর্য ব্যাপার। এই অর্থ আমার মাথায় কেন এসেছে? এইটিই কি আসল অর্থ?

সিগারেট চলে এসেছে। সিগারেট ধরিয়ে চায়ে চুমুক দিয়েছি তখন মোবাইল ফোন সেটে জয়ন্ত টেলিফোন করলেন। আমি ফোন ধরলাম।

জয়ন্ত বললেন, আপনি একটা সংস্কৃত শ্লোকের অর্থ জানতে চেয়েছেন। অর্থটা পেয়েছি। বলব?

আমি বললাম, আমিও অর্থ পেয়েছি। আমারটা আগে শুনে দেখুন অর্থ ঠিক আছে কি না। সকলেই সকল বিষয় জানে না।

জয়ন্ত বললেন, এইটাই অর্থ। ন হি হচ্ছে 'না'।

আমি কি এই শ্লোকের অর্থ টেলিপ্যাথের মাধ্যমে পেয়েছি? জয়ন্ত শ্লোকের অর্থ জেনেছেন। আমাকে জানাতে চেয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি জেনে গেছি। Entanglement থিওরি। তার মানে কি এই আমরা সবাই একে-অপরের সঙ্গে যুক্ত? কিন্তু আমরা তা জানি না। যুক্ত হবার আকাঙ্ক্ষা থেকেই আধুনিক প্রযুক্তি মোবাইল ফোন সেট এসেছে।

আমরা সবাই যে একে-অপরের সঙ্গে যুক্ত তার একটা গল্প বলার লোভ সামলাতে পারছি না। গল্পটা বলেই আমি নলিনী বাবু B.Sc.র মূল গল্পে চলে যাব।

আমি তখন সবে মাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেমিস্ট্রির লেকচারার হিসেবে যোগ দিয়েছি। রসায়ন বিভাগ আমাকে পাঠিয়েছে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে। সাত দিনের একটা কর্মশালা। বিষয় নিজস্ব প্রযুক্তিতে কমদামে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরি।

কর্মশালা শেষ করেছি দেশে ফিরব। এয়ারপোর্টে অপেক্ষা করছি। আমার বিমানের টিকিট। সামান্য যে টাকা সঙ্গে আছে তা দিয়ে এয়ারপোর্টের বুক স্টল থেকে বই কিনলাম। বাচ্চাদের জন্যে এক প্যাকেট চকলেট কিনলাম।

রাত তিনটায় বিমান এলো। আমার কনফার্ম করা টিকিট। আমাকে বলা হলো, বিমান ইউরোপ থেকে যাত্রী বোঝাই হয়ে এসেছে। আপনাকে নেয়া যাবে না।

আমি হতভম্ব হয়ে বললাম, আমি দেশে ফিরব কি ভাবে?

পরের ফ্লাইটে ফিরবেন।

পরের ফ্লাইট কখন?

এক সপ্তাহ পর।

আমি হতাশ গলায় বললাম, ভাই আমার কাছে একটা পয়সা নাই। আমি সপ্তাহ আমি কোথায় থাকব? কি খাব?

বিমানের ম্যানেজার কঠিন মুখ করে বললেন, সেটা তো আমরা জানি না।

বিমান আমাকে ফেলে রেখে চলে গেল। কি ভয়ঙ্কর বিপদে যে পড়লাম তার বিবরণ দিতে চাচ্ছি না। পাঠক নিশ্চয় কল্পনা করতে পারছেন।

আমি যে মহাবিপদে পড়েছি সেই খবর আমার মায়ের জানার কোনোই কারণ নেই। তিনি ঘুমাচ্ছিলেন। ঘুম ভেঙে জেগে উঠলেন। অন্যদের ডেকে তুলে বললেন, আমার ছেলে মহাবিপদে পড়েছে। কি বিপদ আমি জানি না। কিন্তু সে বিরাট বিপদে আছে এটা জানি। আমি খুবই পেরেশান।

আমার মা, ছেলের বিপদের কথা কিভাবে জানলেন? আমরা একে-অপরের সঙ্গে যুক্ত বলেই জানলেন।

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ থাকুক গল্পে ফিরে যাই। শ্লোকের অর্থ জানার পর আষাঢ় মাসের সেই রাতে নলিনী বাবুর কথা আমার বিশেষভাবে মনে পড়ল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম নলিনী বাবুকে খুঁজে বের করব। খুঁজে বের করার প্রক্রিয়া খুব জটিল হবার কথা না। মানসিক রোগীদের চিকিৎসা করা

হয় এমন কোনো একটা ক্লিনিকে তিনি আছেন। ক্লিনিকটা হয় ঢাকায় আর ঢাকায় না হলে চিটাগাংয়ে। এই জাতীয় ক্লিনিকের সংখ্যা খুব বেশি হবার কথা না। বুদ্ধিমান কাউকে দায়িত্ব দিলে সে বের করে ফেলবে। দায়িত্ব দিলাম নুহাশ পল্লীর ম্যানেজারকে। তাকে বললাম, সাত দিনের মধ্যে নলিনী বাবুকে খুঁজে বের করতে হবে।

বুলবুল বলল, স্যার এটা কোনো ব্যাপার না। আমি কাল ভোরেই ঢাকা চলে যাব।

দ্বিতীয় দিনে মাথায় বুলবুল জানাল নলিনী বাবুর খোঁজ পাওয়া গেছে। নলিনী বাবুর অবস্থা ভালো না। তিনি কারো সঙ্গে কথা বলেন না। কাউকে চেনেন না। আপনার কথা বলেছি। আপনাকে চিনতে পারেন নাই। স্যার! আপনি কি আসবেন?

আমি বললাম, কয়েকটা দিন পার হোক। ভদ্রলোক যখন কিছুটা স্বভাবিক হবেন তখন আসব। তাঁকে স্বাভাবিক করার দায়িত্ব তোমার।

নলিনী বাবু যে ক্লিনিকে আছেন সেটা ঢাকা শহরে। সঙ্গত কারণেই ক্লিনিকের নাম বলছি না।

সকাল দশটার দিকে ম্যানেজার বুলবুলকে নিয়ে আমি ক্লিনিকে ঢুকলাম। মনে হলো মিনি জেলখানায় ঢুকেছি। কয়েকটা কলাপসিবল গেট। ভেতরে-বাইরে জেলখানার প্রহরীর মতো দারোয়ান। একজন দারোয়ানকে দেখে মনে হচ্ছে সে বডি বিল্ডার। মিস্টার বাংলাদেশ হবার চেষ্টায় আছে। এই দারোয়ানের গায়ে লাল রঙের গেঞ্জি। তার হাতে লাঠি।

ক্লিনিকের প্রধান (ধরা যাক তাঁর নাম আলিফ, ডা. আলিফ) অতি কৃশকায় মানুষ। মুখের তুলনায় বেমানান গোঁফ রেখেছেন। কলপ দেয়া মাথার চুল চকচক করছে। গোঁফে কলপ দেয়া হয়নি তবে মেহেদি দেয়া হয়েছে। গোঁফ লাল-সাদা। তাঁর চোখে সোনালি ফ্রেমের চশমা। তার প্রধান কাজ চশমাটা খানিকটা নাকের সামনে এগিয়ে আনা এবং পেছানো। ভদ্রলোককে আমার মানসিক রোগী বলে মনে হলো। আমি নলিনী বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই শুনে তিনি বললেন, কেন দেখা করতে চান? আমার দিকে তাকিয়ে বললেন না, জানালার দিকে তাকিয়ে বললেন।

আমি বললাম, নলিনী বাবু আমার পরিচিত। রোগীর সঙ্গে দেখা করার নিয়ম নিশ্চয়ই আছে।

নিয়ম নাই।

নিয়ম নাই মানে? কেউ তার সঙ্গে দেখা করতে পারবে না?

না।

কারণটা ব্যাখ্যা করবেন?

মানসিক রোগীদের আলাদা রাখা হয়। আত্মীয়স্বজন বা পরিচিত জনদের সঙ্গে দেখা হলে তাদের সমস্যা হয়। তাদের যে আলাদা করা হচ্ছে এটাও চিকিৎসার একটা অংশ।

আমি বললাম, ভাই আমি পাঁচ মিনিট থেকে চলে যাব।

ডা. আলিফ চশমা আগ-পিছ করতে করতে বললেন, সম্ভব না। সম্ভব না। সম্ভব না।

নলিনী বাবুর যে আত্মীয় চিকিৎসার খরচ দিচ্ছেন তার ঠিকানাটা কি পেতে পারি?

না।

না কেন?

মানসিক রোগী এবং তার আত্মীয়স্বজনদের সব ইনফরমেশন ক্লাসিফায়েড।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে আছি, ম্যানেজার বুলবুল আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বলল, স্যার আপনি বাইরে দাঁড়িয়ে একটা সিগারেট খান আমি ব্যবস্থা করছি।

ম্যানেজার কিভাবে কি করল আমি জানি না। নলিনী বাবুর সঙ্গে দেখা করার অনুমতি পাওয়া গেল। বডি বিল্ডার দারোয়ানকে সঙ্গে নিয়ে আমি নলিনী বাবুর ঘরে ঢুকে হতভম্ব হয়ে গেলাম।

রট আয়রনের খাটে নলিনী বাবু বসা। তাঁর দুই হাত খাটের সঙ্গে বাঁধা। তিনি হাঁ করে আছেন। তাঁর মুখ দিয়ে লালা পড়ছে। তাঁর চোখ রক্তবর্ণ। নলিনী বাবুর সামনে মেলামাইনের একটা থালায় দু'টা রুটি। একটা বাটিতে খানিকটা ডাল। একটা সিদ্ধ ডিম। ডালের বাটিতে ভনভন করে মাছি উড়ছে।

আমি বডি বিল্ডারকে বললাম, মনে হচ্ছে উনাকে সকালের নাশতা দেয়া হয়েছে। হাত বাঁধা অবস্থায় উনি খাবেন কি করে?

বডি বিল্ডার বলল, খাওয়া মুখে তুলে দেওয়ার লোক আছে।

ইনার হাত বাঁধা কেন?

রোগী ভায়োলেন্ট। মারতে আসে। এই জন্যই বাঁধা।

রাতে যখন ঘুমান তখনো কি হাত বাঁধা থাকে?

রাতে ইনজেকশন দিয়ে ঘুম পাড়ায়া দেই। হাত বান্ধার প্রয়োজন পড়ে না। এক ঘুমে রাইত পার।

কি ইনজেকশন দেন?

সেটা ডাক্তার সাব জানে। আমি কি জানি?

আপনার হাতে লাঠি দেখতে পাচ্ছি। আপনি কি লাঠি দিয়ে মারধোর করেন?

প্রয়োজনে করতে হয়। ধরেন একজন রোগী আপনার উপর ঝাঁপ দিয়া পড়ল। আপনি কি করবেন? মাইর খাবেন না মাইর দিবেন? বুঝেন না কেন এরা সাধারণ রোগী না, এরা মেন্টাল কেইস। আপনার কথা যা বলার তাড়াতাড়ি বলেন। মেন্টাল রোগীর সামনে বেশিক্ষণ থাকার নিয়ম নাই।

আমি নলিনী বাবুর সামনে দাঁড়ালাম। তিনি চোখ তুলে তাকালেন।

নলিনী বাবু আপনি কি আমাকে চিনেছেন?

নলিনী বাবু জবাব দিলেন না। বড় বড় নিশ্বাস নিতে লাগলেন।

আমি যদি আপনাকে এখান থেকে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করি আপনি কি যাবেন?

এইবার নলিনী বাবু হ্যাঁসূচক মাথা নাড়লেন। আমি ঘর থেকে বের হয়ে ডা. আলিফের কাছে গেলাম। তাঁকে বিনীতভাবে বললাম, আমি যদি নলিনী বাবুকে এখান থেকে নিয়ে যেতে চাই আমাকে কি করতে হবে?

ডা. আলিফ বললেন, আপনার করার কিছু নাই। রোগীর বিষয়ে তাঁর আত্মীয় সিদ্ধান্ত নিবে।

সেই আত্মীয়ের ঠিকানা দিন। আমি যোগাযোগ করি।

আপনাকে আগে একবার বলেছি তারপরেও বলি– রোগী এবং তাঁর আত্মীয়স্বজনের সব ইনফরমেশন ক্লাসিফায়েড।

আমি রাগ সামলাতে না পেরে বললাম, আপনার এখানে কি নিউক্লিয়ার এনার্জি নিয়ে গবেষণা হচ্ছে যে সব ইনফরমেশন ক্লাসিফায়েড?

ম্যানেজার কানে কানে বলল, স্যার চলে আসেন। জায়গা ভালো না। আগে বের হই।

পাশের একটা ঘর থেকে গোঁ গোঁ শব্দ হওয়া শুরু করল। গোঁ গোঁ শব্দের সঙ্গে হুটোপুটি; ঝনঝন শব্দে কিছু একটা ভাঙল। লাল গেঞ্জি দ্রুত সেখানে গেল। আমি চিৎকার শুনতে পাচ্ছি। মেয়ে গলায় চিৎকার– মারবেন না। খবরদার গায়ে হাত তুলবেন না।

এত কিছুতেও আমার সামনে বসা ডাক্তার আলিফের কোনো ভাবান্তর হচ্ছে না। তিনি একটা ইংরেজি খবরের কাগজ চোখের সামনে ধরে আছেন।

পাশের কামরার মেয়েটি বিকট আর্তচিৎকার করল। সেই শব্দে ডা. আলিফ মুখের সামনে থেকে খবরের কাগজ নামিয়ে আমাকে বললেন, আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন কেন?

আমি আর থাকা সমীচীন মনে করলাম না।

বাংলাদেশ খুবই ছোট একটা জায়গা। ছোট জায়গার বিশেষত্ব হচ্ছে এখানে সবাই সবাইকে চেনে। মুদির দোকানদারও কোনো না কোনো সূত্রে প্রধানমন্ত্রীর পরিচিত। যে আইসক্রিমের গাড়ি নিয়ে বের হয় তারও আত্মীয়ের আত্মীয় পুলিশের ডিআইজি বা আইজি।

আমিও অনেককে চিনি তবে তারা গুরুত্বপূর্ণ কেউ না। ট্রাকের পেছনে লেখা থাকে একশ এক হাত দূরে থাকুন। আমি গুরুত্বপূর্ণ মানুষদের ট্রাকের মতো মনে করি। তাদের কাছ থেকে একশ এক হাত দূরে থাকি। এতে তারাও ভালো থাকেন, আমিও ভালো থাকি।

সমস্যা হয় যখন গুরুত্বপূর্ণ কাউকে প্রয়োজন পড়ে। এখন যেমন পড়েছে। নলিনী বাবুকে জেলখানা থেকে উদ্ধার করতে হবে। আমার পক্ষে তা সম্ভব না। গুরুত্বপূর্ণ কাউকে দরকার। পরামর্শের জন্য আমি ধানমণ্ডি থানার ওসি কামরুল সাহেবকে খবর পাঠালাম।

তিনি একজন শখের অভিনেতা। আমার কিছু নাটকে অভিনয় করেছেন। একই সঙ্গে শখের সম্পাদক। হাতে কিছু টাকা-পয়সা জমলে পত্রিকা প্রকাশ করেন। পত্রিকার নাম– 'সোনা রঙ'। এই ভদ্রলোক কিছু দিন পর পর আমার কাছে আসেন এবং বিনীত ভঙ্গিতে বলেন, স্যার একটু দোয়া নিতে এসেছি। দোয়া করে দেন।

ওসি কামরুল খবর পেয়েই উপস্থিত হলেন। এবং বললেন, স্যার কি আদেশ।

আমি বললাম, আদেশ না, অনুরোধ। আমার একটা ইনফরমেশন দরকার। ইনফরমেশনটা হচ্ছে– পুলিশের কোনো কর্তাব্যক্তি কি আছেন যিনি হুমায়ূন আহমেদের বই পড়েন। যার কাছে এই লেখকের কিছু গুরুত্ব আছে। যাকে লেখক কোনো অনুরোধ করলে তিনি রাখবেন।

কি অনুরোধ করতে চান স্যার?

আমি নলিনী বাবুর ঘটনাটা বললাম। তাঁকে ক্লিনিক থেকে বের করা দরকার এটা জানালাম।

ওসি কামরুল বললেন, নলিনী বাবুকে বের করার জন্য আইজি, ডিআইজি লাগবে কেন? অধম কামরুলকে আপনার যথেষ্ট মনে হয় না? তাঁকে কি আপনার এই উত্তরার বাসায় নিয়ে আসব?

না তাঁকে নুহাশ পল্লীতে নিয়ে আসতে হবে। এখানে অসুস্থ মানুষটার দেখাশোনার কেউ নাই। নুহাশ পল্লীতে অনেকেই আছে। তাঁকে দেখে-শুনে আসবে।

ওসি সাহেব চলে যাওয়ার তিন ঘণ্টার মাথায় নুহাশ পল্লীর ম্যানেজার জানাল, কিছুক্ষণ আগে নলিনী বাবুকে ওসি সাহেব নুহাশ পল্লীতে নামিয়ে দিয়ে গেছেন। নলিনী বাবু ভালো আছেন।

আমি বললাম, ভালো আছেন বলতে কি বুঝাচ্ছ?

উনি কথা বলেছেন।

কি কথা?

আমাকে বলেছেন, 'স্নান করব।' আমি ব্যবস্থা করেছি। গরম পানি দিয়ে আমি নিজে গোসল দিব।

ডাক্তার এজাজকে খবর দাও। একজন ডাক্তারের পাশে থাকা দরকার।

স্যার আপনি বলার আগেই আমি ডাক্তার সাহেবকে খবর দিয়েছি। উনি আধাঘণ্টার মধ্যে পৌঁছে যাবেন। আপনি কি আসবেন?

এখন আসব না। উনার শরীর একটু সারুক। কথা বলা শুরু হলে আসব।

নুহাশ পল্লীর দিঘীতে দু'টা ঘাট আছে। একটা পুরানো ঘাট, নাম জাপানি ঘাট কারণ জাপান বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রী এই ঘাট বানানোয় সাহায্য করেছিল।

আরেকটা ঘাটের নাম চন্দ্র ঘাট। এই ঘাট পুরোটাই শ্বেতপাথরের। চাঁদের আলো শ্বেতপাথরে পড়লে শ্বেতপাথর থেকে জোছনার মতো আলো বের হয় বলেই চন্দ্র ঘাট।

নলিনী বাবু চন্দ্র ঘাটে বসে আছেন। আকাশে চাঁদ। চাঁদের আলোয় এবং ঘাট থেকে প্রতিফলিত আলোয় তিনি ঝলমল করছেন। আমি তাঁর সামনে বসলাম। ক্লিনিক থেকে ছাড়া পাবার পর আমি প্রথম তাঁকে দেখছি। ম্যানেজার বুলবুল বলেছে তিনি এখন মোটামুটি স্বাভাবিক।

নলিনী বাবু আমাকে চিনতে পারছেন?

তিনি হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লেন। আমি বললাম পরিষ্কার করে বলুন আমি কে। মাথা নাড়ানাড়ি বন্ধ।

নলিনী বাবু বললেন, আপনার সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নাই, কিন্তু আপনি আমার পরম আত্মীয়।

এই তো আপনার মাথায় কথা ফুটেছে। ক্লিনিকে আপনার অবস্থা দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম।

তারা ঘুমের অষুধ দিয়ে মানুষকে জন্তু বানায়ে রাখতে।

কত দিন পর জোছনা দেখছেন?

অনেক দিন পর। আপনি আমাকে পরম শান্তি দিয়েছেন। ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন।

ঈশ্বর বিশ্বাস করেন?

মাঝে মাঝে করি। বেশিরভাগ সময় করি না।

এই মুহূর্তে করছেন?

না।

রাতের খাবার খেয়ে সকাল সকাল শুয়ে পড়ুন। কাল সকালে আপনার সঙ্গে কথা হবে।

আপনি যদি কিছু মনে না করেন রাতটা কি আমি ঘাটে শুয়ে কাটাতে পারি?

অবশ্যই পারেন। আমি একজনকে বলে দিচ্ছি সে আপনার সঙ্গে থাকবে।

একা থাকতে চাচ্ছি।

একা আপনাকে থাকতে দেব না। নুহাশ পল্লীর একজন স্টাফ দূর থেকে আপনার উপর লক্ষ রাখবে আপনি তার অস্তিত্বই টের পাবেন না।

নলিনী বাবুকে রেখে আমি চলে এলাম। রাতে তাঁর ডায়েরি পড়ে শেষ করব। যদি ব্যক্তিগত কিছু পাওয়া যায়।

ডায়েরিতে কিছুই পাওয়া গেল না। সবই থিওরির কচকচানি। এক জায়গায় পাওয়া গেল– 'সীতার অনেক জ্বর। শরীর ভয়ঙ্কর খারাপ করেছে। সারা গায়ে গুটি গুটি বের হয়েছে। মনে হচ্ছে হাম। হাম জীবাণুঘটিত ব্যাধি। পাঁচশ বছর আগে 'নস্ট্রেডেমাস' জীবাণুর কথা বলেছেন। তিনি জীবাণুর আবিষ্কার যে লুই পাস্তুর করবেন তাও বলে গেছেন।

লাল কালি দিয়ে আন্ডার লাইন করা কিছু অংশ পাওয়া গেল। সেখানে লেখা–

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা বলে কিছু নেই।
সে সম্পূর্ণই নিয়ন্ত্রিত Robot.

তার নিচেই জীববিজ্ঞানী Dewitt-এর কিছু লাইন। যে বইটি থেকে লাইনগুলি নেয়া হয়েছে সৌভাগ্যক্রমে বইটা আমার পড়া বইয়ের নাম 'The selfish Gene'

লাইনটা হচ্ছে,

> "What on Earth do you
> think you are? If not a robot, albeit
> a very complicated one?"

যার বাংলাটাও ডায়েরি লেখক করেছেন?

> নিজেকে তুমি কি ভাব হে? তুমি রোবট ছাড়া
> কিছু না তবে জটিল ধরনের রোবট।

ভোরবেলা চায়ের কাপ নিয়ে বের হয়েছি, নলিনী বাবুর সঙ্গে দেখা। নলিনী বাবু হেসে বললেন, সুপ্রভাত।

আমি বললাম, রাত কি শেষ পর্যন্ত ঘাটেই কাটিয়েছেন?

আজ্ঞে না। মশা কামড়াচ্ছিল বলে ঘরে এসে শুয়েছি।

ঘুম হয়েছে?

অতি সুনিদ্রা হয়েছে। ঘুমের অষুধ ছাড়াই সুনিদ্রা।

চা খেয়েছেন?

না।

আসুন চা খেতে খেতে কিছুক্ষণ গল্প করি।

আপনার সঙ্গে আগ্রহ নিয়ে গল্প করব। কিন্তু চা পান করব না।

আমরা দু'জন লিচু বাগানের দিকে রওনা হলাম। নুহাশ পল্লীর সুন্দর জায়গাগুলোর একটি হলো বাঁধানো লিচুতলা। বাঁধানো তলায় বসে গল্প করতে আমার নিজের ভালো লাগে।

নলিনী বাবু! নস্ট্রডেমাসের নাম শুনেছেন?

না। ইনি কে?

পাঁচশ' বছর আগের ফ্রান্সের একজন চিকিৎসক। ভবিষ্যৎ বলতে পারতেন। তাঁর নাম শুনেননি?

না।

জীববিজ্ঞানী Dewitt-এর নামও বোধ হয় শুনেননি।

আজ্ঞে না। প্রথম শুনলাম।

আপনার কি ডায়েরি লেখার অভ্যাস আছে?

না। ডায়েরি লিখবেন মহামানবরা। তারা যা লিখবেন তাতেই অন্যদের জন্য চিন্তার খোরাক থাকবে। আমার মতো অভাজনরা কেন শুধু শুধু ডায়েরি লিখব? ঠিক বলেছি না?

অবশ্যই ঠিক বলেছেন।

সীতাকে চেনেন? রাম লক্ষ্মণের সীতা না। আপনার পরিচিত কেউ আছে নাম সীতা।

হ্যাঁ চিনি।

তার কি কখনো শরীর ভয়ঙ্কর খারাপ করেছিল? গায়ে গুটি বের হয়েছিল?

হাম হয়েছিল। খুব কষ্ট পেয়েছিল। আপনি কিভাবে জানেন?

আমি জবাব দিলাম না। জবাব দেবার সময় আসেনি।

সকালে নাশতা খেতে বসেছি। নলিনী বাবু কিছু খাবেন না। এগারোটার দিকে ভাত খাবেন। তিনি তাঁর আগের একাহারি নিয়মে ফিরে যাচ্ছেন। এটা ভালো লক্ষণ। দ্রুত সুস্থতার দিকে যাওয়া। আমি বললাম, এই ডায়েরিটা উল্টেপাল্টে দেখুন তো, ভালো করে দেখে বলুন ডায়েরির লেখাগুলি কি আপনার?

নলিনী বাবু অনেক সময় নিয়ে দেখলেন। বারবার পাতা উল্টে দেখছেন। তাঁকে অত্যন্ত কনফিউজড মনে হলো।

নলিনী বাবু বললেন, ডায়েরির লেখা আমার। কিন্তু আমি লিখি নাই।

ব্যাপারটা গোলমেলে হয়ে যাচ্ছে না?

হচ্ছে।

ডায়েরিটা আপনার নীলগঞ্জের বাড়ি থেকে আমি এনেছি। এখন ফিরত দিলাম। আপনি নিজে প্রতিটি লেখা খুব মন দিয়ে পড়বেন। আমি কয়েকদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। ফিরে এসে আপনার সঙ্গে বসব।

কোথায় যাচ্ছেন?

সিঙ্গাপুর। আমার হার্টের কিছু সমস্যা আছে। বছরে দু'বার ডাক্তার দেখানোর কথা। আমি অবশ্যি একবার দেখাই।

ক'দিন থাকবেন?

সব মিলিয়ে চার-পাঁচ দিন লাগবে। আপনি আপনার নিজের বাড়িঘর মনে করে এখানে থাকবেন। এরা সবাই আপনার দেখাশোনা করবে। যদি প্রয়োজন মনে করেন নীলগঞ্জ থেকে রামচন্দ্রকে নিয়ে আসবেন।

কাউকে আনতে হবে না। আমি এখানে ভালো আছি।

আপনার যদি লেখালেখি করতে ইচ্ছে করে ম্যানেজারকে বললেই কাগজ-কলম দিবে।

আমি তো লেখক না যে আমার লেখালেখি করতে ইচ্ছে করবে। কাগজ-কলম লাগবে।

আমি বললাম, "ঘুমিয়ে থাকে মহান লেখক অলেখকের অন্তরে।"

নলিনী বাবু সুন্দর করে হাসলেন। আমি বললাম, আমি চাই আপনি আপনার অভিজ্ঞতার কথা লিখে ফেলুন। যা মনে আসে লিখবেন। ভাষা ঠিক হচ্ছে কি না তা নিয়ে ভাববেন না। আমি আপনাদের মিসির আলি না। তারপরেও সমাধান করে ফেলব।

নলিনী বাবু বললেন, সমাধান মানে সমাপ্তি। সমাপ্তি বলে কিছু নেই।

সিঙ্গাপুরে যাওয়া কি কারণে যেন বাতিল হয়ে গেল। আমার জন্যে ভালোই হলো। স্থান বদলের বিষয় চলে এসেছে। ধানমণ্ডিতে আমার নিজের ফ্ল্যাট তৈরি। ফ্ল্যাটটি করা হয়েছে একজন মানুষের জন্যে। বিদেশে এ ধরনের ফ্ল্যাটের নাম স্টুডিও এপার্টমেন্ট। বিশাল একটা শোবার ঘর। একটা লাইব্রেরি। আমি চেয়েছিলাম এমন একটা ফ্ল্যাট যেখানে শুধু বাথরুম দেয়াল বন্দি থাকবে। বাইরের দেয়াল ছাড়া আর কোনো দেয়াল থাকবে না। বসার ঘর, শোবার ঘর, লাইব্রেরি ঘর বলে আলাদা কিছু থাকবে না। একটাই ঘর। বাড়ির আর্কিটেক্ট আমার কলেজ জীবনের বন্ধু করিম। তাকে কিছুতেই রাজি করাতে পারলাম না। সে বলল, তোমার মাথা খারাপ হতে পারে আমার মাথা খারাপ না।

নতুন বাড়িতে সংসার পাতার আলাদা আনন্দ আছে। সেই আনন্দে সময় কাটতে লাগল। আজ এটা কিনি কাল ওটা কিনি। রোজ সন্ধ্যায় আড্ডা। আড্ডা বন্ধ করার জন্যে গৃহিণী নেই। সিগারেটের ধোঁয়ায় বাড়ি গ্যাস চেম্বার হলেও বলার কেউ নেই। আমার বন্ধুরা সন্ধ্যা মিলাবার আগেই চলে আসে। রাত গভীর হলে নিতান্ত অনিচ্ছায় তারা ওঠে। কেউ কেউ আবার থেকেও যায়। তারা বলে, বেচারা হুমায়ূন একা একা থাকবে, আচ্ছা আমিও থেকে যাই।

আমার ফ্ল্যাটের আড্ডার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। আড্ডার নামও দেয়া হলো– বৃদ্ধ বোকা সংঘ। Old fools club. এই ক্লাবে নতুন নতুন সদস্য যোগ হতে থাকল। আমি সাময়িকভাবে নলিনী বাবুর কথা ভুলে গেলাম। ম্যানেজারের কাছে খবর পাই তিনি ভালো আছেন। এক বেলা খাবার খান। সারাদিন ঘুরে ঘুরে গাছপালা দেখেন। সন্ধ্যাবেলা দিঘীর ঘাটে বসে তারা দেখেন। আমার নিজের এক সময় তারা দেখার শখ ছিল। তিনটা টেলিস্কোপ নুহাশ পল্লীতে আছে। আমার তারা দেখার শখ স্থায়ী হয়নি বলে টেলিস্কোপে ধুলা জমেছে। নলিনী বাবু টেলিস্কোপের ধুলা পরিষ্কারের ব্যবস্থা করছেন জেনে ভালো লাগল।

এক বিকেলে শাওন বেড়াতে এলো। তার হাতে প্লাস্টিকের বাটিতে কি একটা খাবার। সে উপস্থিত থাকতেই আমার বন্ধুরা উপস্থিত হওয়া শুরু করল। শাওন আমাকে আড়ালে নিয়ে বলল, এরা কারা?

আমি বললাম আমার বন্ধুরা। আড্ডা দিতে এসেছে।

আমি আপনার এই আড্ডার খবর পেয়েছি। আড্ডা নাকি রাত দু'টা-তিনটা পর্যন্ত চলে।

সব দিন না। মাঝে মাঝে চলে। আড্ডা যখন জমে যায় তখন চলে।

রাতে আপনাদের খাবারের কি ব্যবস্থা। ফ্ল্যাটে তো রান্নার কোনো লোক দেখছি না।

রাতে হোটেল থেকে খাবার আসে।

আপনি দিনে কোথায় খান?

দিনে মাজহারদের ফ্ল্যাট থেকে খাবার আসে। অন্য প্রকাশের মালিক মাজহার। তুমি তো চেনো।

প্রতিদিন খাবার আসে?

হুঁ।

আপনার লজ্জা করে না?

লজ্জা করবে কি জন্যে? মাজহার আমার পুত্রস্থানীয়।

আপনার বাড়ি ভর্তি এইসব কিসের বোতল?

আমি এই প্রশ্নের জবাব দিলাম না। জ্ঞানী মানুষ সব প্রশ্নের জবাব দেয় না। সেই মুহূর্তে জ্ঞানী হবার প্রয়োজন দেখা দিল।

শাওন কঠিন গলায় বলল, আপনি এই ভাবে জীবনযাপন করবেন আমি তা হতে দেব না। আপনার বয়স হয়েছে, আপনার ওপেন হার্ট সার্জারি হয়েছে। আপনার দরকার শান্তি। আপনাকে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে হবে। আপনার অনেক কাজ বাকি।

কি কাজ বাকি?

আপনি বলেছেন মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটা উপন্যাস লিখবেন। লিখেছেন?

না।

মধ্যাহ্ন নামে একটা উপন্যাস লেখার কথা বলেছিলেন। ইংরেজ শাসন থেকে দেশ বিভাগ পর্যন্ত ইতিহাস সেখানে থাকবে। লিখেছেন?

না।

উনসত্তুরের গণআন্দোলন নিয়ে একটা উপন্যাস লেখার কথা ছিল। লিখেছেন?

না।

আজ থেকে এই বাড়িতে আড্ডা বন্ধ। আপনার ভিখিরির মতো অন্য বাড়ির খাবার খেয়ে বেঁচে থাকা বন্ধ।

আমি বললাম, তুমি যে কথাগুলো বলছ সেগুলি বলার জন্য অধিকার লাগে। সেই অধিকার কি তোমার আছে?

শাওন বলল, না অধিকার নাই। এবং কোনোদিন যে অধিকার হবে না তাও জানি।

তার চোখ দিয়ে টপটপ করে পানি পড়তে লাগল।

মেয়েরা চেষ্টা করে তাদের চোখের পানি দ্রুত মুছে ফেলতে। শাওন তা করল না, চোখ ভর্তি পানি নিয়ে দ্রুত চলে গেল। আমি আড্ডা ভেঙে দিয়ে ফ্ল্যাটে তালা লাগিয়ে নুহাশ পল্লীর দিকে রওনা হলাম।

ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের খুঁটিনাটি বর্ণনার বিশেষ কারণ আছে। নিজের জীবন নিয়ে ভাবতে ভাবতেই আমি নলিনী বাবুর রহস্যের মোটামুটি একটা মীমাংসা দাঁড়া করাই। মীমাংসায় পৌছানোর প্রক্রিয়াটা বলা প্রয়োজন বোধ করছি।

রাত।

গাড়ি যাচ্ছে নুহাশ পল্লীর দিকে। হঠাৎ বৃষ্টি শুরু হওয়ায় গাড়ির গতি মন্থর। আমি মাথার উপরের সানরুফের ঢাকনি খুলে দিয়েছি। কাচের সানরুফে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে। দেখতে ভালো লাগছে। আমি বৃষ্টির ফোঁটা দেখতে দেখতে ভাবছি কোয়ান্টাম বিজ্ঞানীরা যে সমান্তরাল জগতের (Parallal Universe) কথা ভাবেন তা সত্যি হলে আমার জীবনে স্পষ্ট কিছু বিভাজন আছে। বিভাজনগুলি কেমন

প্রথম জগৎ

এখানে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। লেখক না। নাটক-সিনেমা বানাই না। লেখাপড়া নিয়ে থাকি। প্রবল অর্থকষ্ট আছে। পারিবারিকভাবে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপন করছি।

দ্বিতীয় জগৎ

এই জগতে আমি একজন লেখক তবে ব্যর্থ লেখক। আমার বই বিক্রি হয় না। সমালোচকরা ভালো বলেন। চরম অর্থকষ্ট। অর্থকষ্টের কারণে পরিবারে অশান্তি। ছেলেমেয়েদের পড়ালেখা করানোর সঙ্গতি নেই। এদের কেউ কেউ ড্রাগ ধরেছে।

তৃতীয় জগৎ

সংসার থেকে বিতাড়িত এখন যে জগতে আছি সেই জগৎ। একা থাকছি। বন্ধুবান্ধব আছে এই পর্যন্তই।

চতুর্থ জগৎ

শাওনের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছে। জীবনযাত্রায় শৃঙ্খলা এসেছে।

সমান্তরাল জগতের থিওরি হিসেবে এই চারটি জগৎ ছাড়াও আরো অগুনতি জগৎ আমার জন্যে চালু হয়েছে। প্রতিটি জগতেরও অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। আমি যা বলছি তা কল্পবিজ্ঞানের কথা না বিজ্ঞানের কথা। বিজ্ঞান ছাড়াও ধর্মশাস্ত্রে ভিন্ন জগতের কথা বলা হয়। সাধু-সন্ন্যাসীরা এর অস্তিত্ব স্বীকার করেন। কঠিন যোগ ব্যায়ামের মাধ্যমে নাকি অন্য জগতে কিছু সময়ের জন্য হলেও উপস্থিত হওয়া যায়।

ড্যান্সিং দরবেশরা বলেন, নাচতে নাচতে তাদের ভেতর যখন মত্ততা চলে আসে তখন তারা হঠাৎ লক্ষ করেন তাদের চারপাশের জগৎ বদলে গেছে। তারা অন্য কোথাও আছেন।

সাধু-সন্ন্যাসী বা ড্যান্সিং দরবেশরা যে কাজটি নানা জটিল প্রক্রিয়ায় করেন তা অতি সহজে কিছু লতাপাতা চিবিয়েও করা যায়। এসব লতাপাতায় থাকে এমন সব যৌগ যা ব্রেইন কেমিস্ট্রি বদলাতে পারে। উদাহরণ 'Rauwolfia serpentinum'.

সুইস রসায়নবিদ আলবার্ট হফম্যান LSD তৈরি করেছিলেন (Lysergic acid diethylamide) এই ভয়াবহ যৌগ তিনি নিজে খানিকটা খেয়েছিলেন। তিনি বললেন, এই বস্তু তার পৃথিবীটাকে বিস্তৃত করে দিয়েছিল। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তিনি কিছুক্ষণের জন্য হলেও বুঝতে পেরেছিলেন।

যেসব স্কিজিওফ্রেনিক রোগী অন্য রিয়েলিটির ভেতর দিয়ে যায় তাদেরকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এদের শরীরে Dimethoxyphenyle thylamine পাওয়া যায়। এই যৌগ পারমাণবিক গঠন adrenalin এবং mescaline-এর কাছাকাছি। adrenalin এবং mesaline ব্রেইন কেমিস্ট্রি নিয়ন্ত্রণ করে। স্কিজিওফ্রেনিকদের শরীরে

আপনাআপনি যে ড্রাগ তৈরি হয় সেই ড্রাগ তাকে অন্য রিয়েলিটিতে নিয়ে যায়।

আমেরিকায় যখন Ph.D. করি তখন একবার অন্য জগতে যাবার ইচ্ছে হয়েছিল। আমি LSD ট্যাবলেট জোগাড় করেছিলাম। সাহসের অভাবে খেতে পারিনি।

নর্থ ডাকোটা স্টেট ইউনিভার্সিটির রসায়ন বিভাগের একজন শিক্ষক (নাম ভুলে গেছি) ভলেন্টিয়ার হয়ে LSD খেয়েছিলেন। তিনি বলেছেন– "I entered into the strange world of many realities." অর্থাৎ আমি অসংখ্য বাস্তবতার অদ্ভুত জগতে প্রবেশ করেছিলাম। এই বাস্তবতার ব্যাখ্যাই হলো এমন এক সমস্যা। যার সমাধান নেই।

আমি নিজেও একবার ভিন্ন বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছিলাম। তার স্থায়িত্ব ছিল মাত্র কয়েক সেকেন্ডের। ঘটনাটা এ রকম।

আমি তখন উত্তরার বাসায় থাকি। খাবার হোটেল থেকে আসে। একটা কাজের লোক রেখেছিলাম রফিক নাম। সে এক ভোরবেলায় আমার মানিব্যাগ নিয়ে পালিয়ে গেল। অনেকগুলি টাকা ছিল মানিব্যাগে। মন খুবই খারাপ হলো, ঠিক করলাম কাজের লোক রাখব না। আমার তাতে তেমন অসুবিধাও হচ্ছিল না।

বিরাট বিপদে পড়লাম এক রোজার ঈদে। ঈদে হোটেল-রেস্টুরেন্ট থাকে বন্ধ। সকালের নাশতা এলো না। আমি উত্তরা থেকে ধানমণ্ডি চলে এলাম। ধানমণ্ডিতে তখন প্রকাশক আলমগীর রহমান থাকেন। তাঁর ঘর তালবদ্ধ। তিনি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে ঈদ করতে গেছেন তাঁর পৈতৃক বাড়ি গেণ্ডারিয়াতে।

আমি গেলাম মাজহারের খোঁজে। মাজহারও নেই। সে তার স্ত্রী এবং এক পুত্রকে নিয়ে তার শ্বশুরবাড়ি গেছে।

পল্লবীতে আমার মা থাকেন। তিনিও আমার ভাইবোনদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আমাকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করেছেন। তাঁর কাছে গেলে তিনি নিশ্চয়ই অভুক্ত পুত্রকে তাড়িয়ে দেবেন না। কিন্তু আমার লজ্জা লাগল। অভিমানও হলো। ওদিকে গেলাম না।

শাওনের বাসায় কি যাব? এমন না যে তার বাসায় যায় না। তবে আজ যেহেতু ঈদের দিন সে নিশ্চয় সেজেগুজে বান্ধবীদের বাড়িতে যাবার প্রস্তুতি

নিচ্ছে। এমন অবস্থায় আমার উপস্থিত হওয়াটা কেমন হবে? সে যদি জানতে পারে ঈদের দিন আমি ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুরছি তাহলে খুবই কষ্ট পাবে। আনন্দের একটা দিনে এমন কষ্ট কি আমি তাকে দিতে পারি?

আমি ক্ষুধা সহ্য করতে পারি না। খাবারের কোনো ব্যবস্থা না থাকায় ক্ষুধা চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে লাগল। বের হলাম রেস্টুরেন্টের সন্ধানে। ঈদের দিন যে সব রেস্টুরেন্ট বন্ধ থাকে তা জানতাম না। হতাশ, ক্লান্ত এবং ক্ষুধার্ত অবস্থায় বাসায় ফিরলাম। দরজা বন্ধ করে হাত-মুখ ধুয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। হাতে একটা বই। বই পড়ে যদি ক্ষুধা ভুলে থাকা যায়। আইজাক এসিমভের রোবটদের গল্প।

তখন একটা ঘটনা ঘটল। কীভাবে ঘটল, আমি জানি না। হয় আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। যা দেখার ঘুমের মধ্যে দেখেছি। কিংবা কিছুক্ষণের মধ্যে আমি অজ্ঞান হয়ে গেছি বা অন্য কিছু। হঠাৎ দেখি, বাইরে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। বৃষ্টির ছাটে ঘর ভেসে যাচ্ছে।

দশ-এগারো বছরের একটা ছেলে জানালা বন্ধ করার চেষ্টা করছে। বন্ধ করতে পারছে না।

ছেলেটা দেবদূতের মতো সুন্দর। এবং দেখতে অবিকল আমার মতো। আমি তার দিকে তাকিয়ে বললাম–

রাশেদ বাবাটিং

দরজা বন্ধ করছিং

আমি বই পড়ছিং

এবং মজা পাচ্ছিং।

ছেলেটা বলল, বাবা আমি ভিজে যাচ্ছি। আমার ঈদের নতুন শার্ট ভিজে যাচ্ছে।

আমি বললাম, ভিজুক।

সে বলল, ঘরের ভেতর পানির সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে বাবা।

আমি বললাম, হোক সমুদ্র। আমরা সমুদ্র স্নান করব।

হঠাৎ আমার সম্বিৎ ফিরল। আমি দেখলাম, আমি বই হাতে খাটে বসে আছি। কোথাও কোনো ঝড়-বৃষ্টি হচ্ছে না। আমার ঘরে কেউ নেই। অথচ যা দেখেছি, অত্যন্ত স্পষ্ট দেখেছি।

আমার প্রথম পুত্র রাশেদ জন্মের তৃতীয় দিনের দিন মারা যায়। আমি তাকেই দেখেছি। আমার মস্তিষ্ক কি কিছুক্ষণের জন্য আমাকে বিভ্রান্ত

করেছে? নাকি যে Parallel world-এর কথা বলা হয় তা প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়াল। কিছুক্ষণের জন্যে আমার কাছে ধরা দিয়েছে। সেই জগতে পুত্র রাশেদ বেঁচে আছে।

মানুষের মস্তিষ্ক অতি জটিল, অতি দুর্বোধ্য এক বস্তু। তার কাণ্ডকারখানা বিজ্ঞানীদের কাছে এখনও স্পষ্ট না। মস্তিষ্কের Frontal lobe-এর কী কাজ তা এখনও কেউ ধরতে পারেনি। Frontal lobe কেটে পুরোপুরি বাদ দিলেও মানুষের কোনো সমস্যা হয় না। মস্তিষ্কের একটি অংশের নাম Thalmus. এ অংশটি মানুষের চিন্তাশক্তির নিয়ন্ত্রক। এর নিচেই Hypothalamus-এর অবস্থান। হাইপোথেলামাসের কারণেই মানুষ আনন্দ-বেদনার অনুভূতি পায়। মস্তিষ্কের এ অংশটি অনুভূতি নিয়ন্ত্রক। এই অংশ উত্তেজিত হলে অনেক কিছুই ঘটতে পারে। সাইকোলজিস্টরা বলেন, মস্তিষ্কে অক্সিজেনের অভাব ঘটলে প্রবল ক্ষুধা এবং শারীরিক ও মানসিক যাতনায় হাইপোথেলামাস উত্তেজিত হয়। তখন মানুষের বিচিত্র সব অনুভূতি হয়।

আমেরিকার Duke বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃত্রিমভাবে হাইপোথেলামাস উত্তেজিত করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ব্যাপারটা এ রকম– সাইকোলজিস্টরা বললেন, মানুষ ছয়টি ইন্দ্রিয় দিয়ে বাইরের জগতের সঙ্গে যোগাযোগ করে। যোগাযোগ পুরোপুরি বন্ধ করে দিলেই মস্তিষ্ক অসহায় হয়ে পড়বে। সে বুঝতে পারবে না এখন কী হচ্ছে। মস্তিষ্কে প্রবল অস্থিরতা দেখা দেবে। এই অস্থিরতা থেকে মুক্তির জন্য সে বিচিত্র কর্মকাণ্ড শুরু করবে।

মস্তিষ্ক বাইরের জগৎ থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হলে কী করে তা দেখার জন্য তারা অদ্ভুত এক পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। শব্দনিরোধী (Sound proof) একটা ঘর তৈরি হলো। সেই ঘরে চৌবাচ্চায় একজন মানুষকে রাখা হলো। চৌবাচ্চার পানিতে কপার সালফেট মিশিয়ে তার ঘনত্ব করা হলো মানুষের শরীরের ঘনত্বের সমান। পানির তাপ রাখা হলো মানুষটির শরীরের তাপমাত্রায়। মানুষটির নাক বন্ধ করে দেওয়া হলো যাতে সে ঘ্রাণ না পায়। ঘর পুরোপুরি অন্ধকার করে দেওয়া হলো। অর্থাৎ মানুষটির প্রতিটি ইন্দ্রিয়ের কর্মক্ষমতা বন্ধ করে দেওয়া হলো। পরীক্ষা শুরু হলো সাতজন ভালেন্টিয়ারকে নিয়ে। তারা সবাই ডিউক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। প্রত্যেককে এক ঘণ্টা করে আলাদা ঘরে ঢোকানো হলো।

পরীক্ষার ফলাফল হলো ভয়াবহ। সাতজনের মধ্যে দু'জন বদ্ধ উন্মাদ হয়ে বের হলো। একজন বাকশক্তি হারিয়ে ফেলল। একজন বলল, সে অদ্ভুত এক জগতে চলে গিয়েছিল। সেই জগতে কোনো মাধ্যাকর্ষণ নেই। সবাই ইচ্ছা করলেই ভাসতে পারে। একজন বলল, সে তার মৃত পিতা, মাতা, দাদা-দাদিকে দেখতে পেয়েছে, তাদের সঙ্গে কথা বলেছে। বাকি তিনজন বলল, তারা যে দেখেছে এবং শুনেছে তা তারা প্রকাশ করতে চাচ্ছে না। শুধু এইটুকু বলবে যে, ঈশ্বরের সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছে।

আমার ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই এ রকম কিছু ঘটেছে। ক্ষুধা এবং ক্লান্তিতে শরীর অবসন্ন। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রবল হতাশা বোধ। আমার মস্তিষ্ক প্রবলভাবে উত্তেজিত হয়ে মৃত পুত্রকে উপস্থিত করেছে আমার সামনে।

আমার হাতে নলিনী বাবুর লেখা কিছু কাগজ। তিনি যে শুধু গাছপালা এবং আকাশের তারা দেখে বেড়াচ্ছেন তা না। মাঝে মাঝে লেখালেখিও করেছেন। যারা সুন্দর করে গল্প করে তারা সুন্দর করে লেখে। ব্যাপারটা নিপাতনে সিদ্ধের মতো।

নলিনী বাবু বেশ গুছিয়ে লিখেছেন। লেখাকে নানান অংশে বিভক্তও করেছেন। শুরুর অংশের নাম– ধন্যবাদ পত্র। এ রকম অনেক অংশ আছে। তবে সব লেখাই সংক্ষিপ্ত।

ধন্যবাদ পত্র

> লেখক সাহেব! আপনি আমাকে অপূর্ব এক বাগানে ছেড়ে দিয়েছেন। আমি একা একা বাগানে হাঁটি। নিজেকে তখন আদি পুরুষ আদমের মতো মনে হয়। যেন এই পৃথিবীতে আমি একা। আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি স্বর্গের উদ্যানে। আমাকে স্বর্গবাসের সুযোগ করে দিয়েছেন, আপনাকে ধন্যবাদ।

ধন্যবাদ পত্রের পরের অংশের নাম– সীতা।

সীতা

> লেখক সাহেব! আপনি হঠাৎ করে সীতা প্রসঙ্গ তুলায় আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। ডায়েরি পড়ে বিস্ময়ের সমাপ্তি হয়েছে। বুঝতে পেরেছি ডায়েরিতে সীতার নাম পড়েছেন বলে তার বিষয়ে প্রশ্ন করেছেন। এক বিস্ময়ের সমাপ্তি হলেও এখন অন্য বিস্ময়! ডায়েরিতে এই নাম কে লিখল?

ডায়েরি

আমি অতি মনোযোগে ডায়েরি পড়েছি। জটিল সব জ্ঞানের কথা আমার মাথার উপর দিয়ে গিয়েছে। ডায়েরিতে একটি সংস্কৃত শ্লোক পড়ে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। এই শ্লোক আমার মা বলতেন। আমি যেসব শ্লোক জানি সবই মা'র কাছ থেকে শেখা। এই শ্লোকটা ভুলে গিয়েছিলাম।

ভেকো মকমকায়তে
দিব্যং চূতফলং প্রাপ্য
ন গর্বং যাতি কোকিলঃ
পীত্বা কর্দমপানীয়ং
ভেকো মকমকায়তে ॥

(অর্থ)

কোকিল আম ফল খেয়েও গর্বিত হয় না। কিন্তু ব্যাঙ কর্দমযুক্ত জলপান করেও গর্বে মকমক শব্দ করতে থাকে।

অশোক বৃক্ষ এবং অর্শ ব্যাধি

আজ একটি অশোক গাছের নিচে দাঁড়িয়ে ছিলাম। কি সতেজ প্রাণশক্তিতে ভরপুর এক বৃক্ষ। আমাদের বাড়ির পেছনে পুকুর ঘাটের কাছে একটা অশোক গাছ ছিল। কোনো এক বিচিত্র কারণে আমার মা গাছটাকে অত্যন্ত পছন্দ করতেন (আমার দুঃখ জগতের মা'র কথা বলছি)। বাবার এক সময় অর্শ রোগ হলো। তিনি রোজ অশোক গাছের ছাল কেটে নিয়ে যেতেন। অর্শ রোগ থেকে মুক্তির জন্য সেই ছালসেদ্ধ রস খেতেন। মা'কে দেখতাম গাছের ছাল কাটা অংশে হাত বুলাতে বুলাতে বলতেন, আহারে! আহারে। ছাল কাটার কারণেই হয়তো অশোক গাছ মারা যায় তবে বাবা সুস্থ হয়ে ওঠেন।

একটি রসিকতা

নীলগঞ্জ হাইস্কুলে পাঠদানের সময় আমি মাঝে কিছু রসিকতা করতাম। ছাত্রীরা প্রভূত আনন্দ পেত। তখনকার একটি রসিকতা হঠাৎ মনে পড়ায় একা একা অনেকক্ষণ হেসেছি। নুহাশ পল্লীর ম্যানেজার আমাকে বলল, কি হয়েছে?

আমি বললাম, কিছু হয় নাই। ম্যানেজার চিন্তিত মুখে তাকাচ্ছে। মনে হলো সে ভেবেছে আমি আবারও পাগল হয়ে যাচ্ছি। রসিকতাটা বলি– এক তরুণী মেয়ের উপর বজ্রপাত হয়েছে। মেয়েটি মারা গেছে। কিন্তু তার মুখ ভর্তি হাসি। পাড়ার লোক অবাক হয়ে বলল, মেয়েটা বজ্রপাতের সময় হাসছিল কেন? মেয়ের মা বললেন, সে ভাবছিল ফ্ল্যাশ লাইট দিয়ে কেউ তার ছবি তুলছে, তাই হাসি হাসি মুখ করে ছিল।

ফিরে যেতে চাই

আমি ফিরে যেতে চাই। নীলগঞ্জে না। ক্লিনিকে ফিরে যেতে চাই।

ফিরে যেতে চাই অংশ পড়ে বিস্মিত হলাম। যিনি এই জায়গাটাকে স্বর্গভূমি বলছেন তিনি কেন স্বেচ্ছায় নরকে ফিরে যেতে চাইবেন? নুহাশ পল্লীর ম্যানেজারের সঙ্গে কথা হলো। সে বলল, স্যার উনার মাথা পুরাপুরি সারে নাই।

আমি বললাম, এ রকম মনে হচ্ছে কেন?

স্যার উনি নিজের মনে হাসেন। একবার দেখি টেলিস্কোপে তারা দেখতে দেখতে এমন হাসি শুরু করলেন। আমি দৌড় দিয়ে গেলাম। বললাম, কি হয়েছে? হাসেন কেন? উনি বললেন, স্বাতী নক্ষত্র দেখে হাসি এসে গেল। হাসি ছাড়াও উনার আরো পাগলামি আছে।

কি রকম?

কোনো একটা গাছ পছন্দ হলে উনি গাছের চারদিকে ঘুরতে থাকেন। আমি একবার দূর থেকে গুনেছি কত বার ঘুরেন। নাগলিঙ্গম গাছটার চারদিকে তিনি চল্লিশ বার ঘুরেছেন।

আমি বললাম, উনি খেয়ালি মানুষ বলে এই রকম করেন। তাঁর মধ্যে এই মুহূর্তে কোনো পাগলামি নেই। আমার অন্তত চোখে পড়ছে না।

ম্যানেজার বলল, আমি নিজে ভয়ে ভয়ে থাকি। এ রকম মানুষ তো দেখি নাই। কখন কোন বিপদ হয়।

কোনো বিপদ হবে না। তারপরও সাবধান থাকা ভালো।

স্যার আমি আপনার অনুমতি ছাড়া একটা কাজ করেছি। উনার যে কেয়ারটেকার আছে তাকে চিঠি লিখেছি চলে আসার জন্যে। পরিচিত একজন থাকলে উনার জন্যে ভালো। আমাদের জন্যেও ভালো। স্যার ঠিক আছে না?

হ্যাঁ ঠিক আছে।

সন্ধ্যা সবে মিলিয়েছে।

আমি আর নলিনী বাবু জাপানি ঘাটে বসে আছি। নলিনী বাবুর সঙ্গে টেলিস্কোপ আছে। খাতা-কলমও দেখছি। আমি বললাম, অন্ধকারে লিখবেন কি ভাবে?

নলিনী বাবু বললেন, আমার চোখের দৃষ্টি ভালো। আমি নক্ষত্রের আলোতেও লিখতে পারি। বেশিরভাগ লেখাই আমি তারা দেখার ফাঁকে ফাঁকে অন্ধকারে লিখেছি।

আপনার লেখায় পড়লাম আপনি ক্লিনিকে ফিরে যেতে চান। কেন?

নলিনী বাবু বললেন, ক্লিনিকে ফিরে যাবার পিছনে আমার কঠিন যুক্তি আছে। আপনি যুক্তিবাদী মানুষ। যুক্তি শুনলে নিজেই ক্লিনিকে ভর্তি করিয়ে দিয়ে আসবেন।

আমি বললাম, শুনি আপনার ক্লিনিকে ফিরে যাবার কারণ এবং যুক্তি।

নলিনী বাবু শান্ত গলায় বললেন, ওরা সেখানে আমাকে কড়া ঘুমের অষুধ দেয়, কঠিন কঠিন ড্রাগ খাওয়ায়, এতে আমার ঘোরের মতো হয়। খুব সহজেই এক জগৎ থেকে আরেক জগতে যেতে পারি। কত জগৎ যে দেখেছি। আহারে! একটা জগৎ দেখলাম নীল পাতার গাছের জগৎ। গাছের কাণ্ডও নীল, পাতাও নীল। আমাদের আকাশ নীল। সেখানের আকাশ ঘন কালো। সূর্য দু'টা। একটা প্রকাণ্ড, একটা ছোট। আমাদের সূর্যের দিকে তাকানো যায় না। ওদের সূর্যের দিকে তাকানো যায়। ছোট সূর্যটা বড়টার চারদিকে ঘুরছে।

ঐ জগতে আপনি একাই ছিলেন না-কি আরো কেউ ছিল?

শুধু আমরা দু'জন।

আপনারা দু'জন মানে কি? আপনি আর কে?

নলিনী বাবু জবাব না দিয়ে টেলিস্কোপ নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলেন। আমি বললাম, আপনি আর সীতা?

নলিনী বাবু নিচু গলায় বললেন, আমি আর সুলতানা। আমার ছাত্রী। ক্লাস টেন। বিজ্ঞান বিভাগ। আমি বললাম, আর কোন জগতে গেছেন সেটা শুনি।

অল্প সময়ের জন্য পুরোপুরি পানির একটা জগৎ দেখেছি। পানিতে ছোট ছোট দ্বীপ। প্রতিটি দ্বীপে দু'জন করে মানুষের থাকার ব্যবস্থা। নারিকেল গাছের মতো গাছে দ্বীপ ভর্তি। তবে গাছগুলি ছোট ছোট। নারিকেলের মতো ফল ফলে আছে। হাত দিয়ে পাড়া যায়।

ফল খেয়ে দেখেছেন?

আমি খাইনি, সে খেয়ে দেখেছে।

সুলতানা খেয়ে দেখেছে?

হুঁ। বলেছে ফলের পানিটা টক টক আর শাঁস অসম্ভব মিষ্টি।

আমি হতাশ গলায় বললাম, আপনি যা দেখেছেন সবই তো Drug induced hallocination. আপনার শুরুর গল্প কিছুটা হজম করা যায়। আপনার দু'টা মাত্র জগৎ। একটা থেকে আরেকটায় যাচ্ছেন। এখনকার গল্প হজম করার কোনো কারণ নেই।

আপনাকে হজম করতে বলছি না। হতে পারে যা দেখছি সবই মিথ্যা কিন্তু আমি আনন্দ পাচ্ছি। এক জগৎ থেকে আরেক জগতে যাচ্ছি। কিছু সময় পানির নিচের জগতে ছিলাম। সেটা বলব?

না।

দয়া করে শুনুন। ঐ জগতে মানুষ থাকে পানির নিচে। বাস করে মাছের মতো। তারা ঝাঁক বেঁধে ঘুরে। ঘুরে বলা ঠিক না। সবসময় স্রোতের বিপরীতে সাঁতরাতে হয়। এই যাত্রা স্রোতের উৎসের সন্ধানে যাত্রা।

আপনি যে ঝাঁকে ছিলেন, সেই ঝাঁকে নিশ্চয়ই সুলতানা মেয়েটাও আছে।

হুঁ। আমার ধারণা হচ্ছে আপনি আমার কথা শুনে খুবই বিরক্ত হচ্ছেন।

আমি বললাম, আপনার ধারণা সঠিক। যথেষ্টই বিরক্ত হচ্ছি। আপনি প্রলাপ বকছেন। অন্যের প্রলাপ যে শুনবে সে তো বিরক্তই হবে।

নলিনী বাবু বললেন, থাক আর কিছু বলব না। আমি বললাম, সুলতানা মেয়েটির সঙ্গে আপনার প্রণয়ের অংশটি আপনি বলেননি। ঐ অংশটি শুনতে চাচ্ছি। বলতে কি আপত্তি আছে?

আপত্তি নাই। কিঞ্চিৎ লজ্জা বোধ করছি।

আমি বললাম, অন্ধকার হলো লজ্জাহর। অন্ধকার লজ্জা হরণ করে। আপনি তারা দেখতে দেখতে এই অংশটা বলুন।

নলিনী বাবু বড় করে নিশ্বাস নিয়ে গল্প শুরু করলেন, গ্রামের স্কুলের মেয়েরা মধ্যম মানের ছাত্রী হয়ে থাকে। সুলতানা তার ব্যতিক্রম ছিল। শান্ত চেহারার অতি লাজুক এক মেয়ে। চোখে চোখ পড়লে তৎক্ষণাৎ চোখ নামিয়ে নিত। ক্লাসে আসত শাড়ি পরে। শাড়ির উপর চাদর। চাদরে মাথা ঢাকা। আমি আপনাকে আগেই বলেছি ক্লাসে আমি রসিকতা করতাম। সবাই হাসত, এই মেয়েটা কখনো হাসত না। সে একমাত্র মেয়ে যে প্রশ্নের উত্তর দিত না। পরে শুনলাম সে শুধু আমার প্রশ্নেরই উত্তর দেয় না। অন্য শিক্ষকদের প্রশ্নের উত্তর ঠিকই দেয়। আমি ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারলাম না।

এক মাঘ মাসের কথা। আমি জ্বরে পড়েছি। ভালো জ্বর। ডাক্তাররা আশঙ্কা করছেন নিউমোনিয়া। ঘরে পড়ে আছি। চিকিৎসা চলছে। রোগ আরোগ্য হচ্ছে না। বরং বাড়ছে।

আমার শরীর খুব খারাপ করেছে। নিশ্বাসের কষ্ট শুরু হয়েছে। চোখ বন্ধ করে পড়ে আছি। হঠাৎ ঠাণ্ডা একটা হাত কপাল স্পর্শ করল। হাতে লেবুর গন্ধ। আমি চমকে তাকালাম। অবাক হয়ে দেখি সুলতানা। আমাকে তাকিয়ে থাকতে দেখেও সে হাত সরিয়ে নিল না। আমি অবাক হয়ে বললাম, তুমি।

সুলতানা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল।

আমি বললাম, একা এসেছ? কেউ কি জানে তুমি এসেছ?

সুলতানা ক্ষীণ গলায় বলল, কেউ জানে না।

আমি বললাম, করেছি কি, যাও তাড়াতাড়ি বাসায় যাও।

সে বলল, স্যার আমি যাব না।

কেন যাবে না? ||মূর্ছনার সৌজন্যে নির্মিত ই-বুক||

সুলতানা ফুঁপিয়ে কাঁদলে থাকল। এই আমার তার সঙ্গে শেষ দেখা। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার বাসা থেকে তার বাবা আর তার ভাই এসে তাকে

নিয়ে গেল। প্রায় জোর করে তাকে নেওয়া হলো। তার স্কুলের পড়াশোনা বন্ধ করে দেয়া হলো। তাকে পাঠিয়ে দেয়া হলো কুমিল্লায়।

নলিনী বাবু চুপ করলেন। আমি বললাম, আপনি যখন দুঃখ জগৎ থেকে সুখ জগতে যান তখন কি সুলতানাকে দেখেন?

হ্যাঁ।

কি ভাবে দেখেন?

স্ত্রী হিসেবে দেখি। সেখানে তার নাম সীতা। সে আমার স্ত্রী।

আমি বললাম, নলিনী বাবু আপনার বিভিন্ন জগতে ভ্রমনের পুরো ব্যাপারটা মানুষিক। বিশেষ করে ভ্রাগ খেয়ে যা দেখছেন। ইচ্ছাপুরনের একটা বিষয় কাজ করেছে। সুলতানার সঙ্গে জীবনযাপনের প্রবল বাসনার কারনেই আপনি যে জগতে যাচ্ছেন সেখানেই সুলতানা মেয়েটিকে দেখছেন।

নলিনী বাবু বললেন, হতে পারে।

আপনি ভিন্ন ধর্মের মানুষ। একটি মুসলমান মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক হওয়া বেশ কঠিন। কাজেই আপনার মস্তিষ্ক মেয়েটিকে হিন্দু বানিয়ে দিয়েছে। তবে নামের কিছু মিল রেখেছে। সুলতানা হয়েছে সীতা।

আপনার যুক্তি ভালো, মিসির আলি সাহেবের মতো। ডায়েরির ব্যাপারটা বলবেন?

আমি বললাম, ডায়েরির ব্যাপারটায় কিছু রহস্য অবশ্যই আছে। ডায়েরি আপনারই লেখা এতে সন্দেহ নেই। এই ডায়েরি অন্য জগৎ থেকে এখানে চলে এসেছে তা হতেই পারেনা। কোয়ান্টাম মেকানিক্স দুই জগৎ বা অসংখ্য জগৎ স্বীকার করে তবে এক জগতের বস্তু অন্য জগতে স্থানান্তর স্বীকার করেনা। স্থানান্তর মানেই ওয়েভ ফাংশনের কলাপস। জগতের বিলুপ্তি।

নলিনী বাবু বললেন, ডায়েরিতে লেখা আমার মায়ের কিছু শ্লোক আমি জানি। বাকি কিছুই জানি না। এটা আপনাকে বিশ্বাস করতে হবে। নস্ট্রেডেমাসের নাম প্রথম শুনেছি।

আমি আপনার কথা বিশ্বাস করছি। নিদ্রাচারে রতিনিশা বলে একটা ব্যাপার আছে। মানুষের মধ্যে প্রবল ঘোর তৈরি হয় তখন সে এই ঘোরের মধ্যে লেখে। ঘোর তৈরির কারন অজানা।

নলিনি বাবু বললেন, ডায়েরির ব্যাপারটা নিয়ে আমি অনেক ভেবেছি। মূর্খের ভাবনা গুরুত্বপুর্ন কিছু না। আপনাকে বলব?

অবশ্যই বলবেন।

আমার কেন জানি মনে হচ্ছে প্রতিটি জগতে আমার শরীর আলাদা। আমি যখন এক জগৎ থেকে আরেক জগতে যাই তখন আমার শরীর যায় না। আমার চিন্তাটা যায়। স্মৃতিটা যায়।

আমি বললাম, আপনার এই চিন্তা খুব পরিষ্কার চিন্তা। আমাদের শরীর হলো কম্পিউটারের হার্ড ডিস্ক। চিন্তাটা হলো সফটওয়ার। কোনো অদ্ভুত ব্যাখ্যাতিত কারণে হয়তো দুই জগতের সফটওয়ার ওভার লেপিং হচ্ছে। আপনি ডায়েরি লিখছেন ঠিকই কিন্তু তখন সফটওয়ার বা আপনার চিন্তা এবং স্মৃতি অন্য জগতের। সেই জগতের মানুষটা স্মৃতি কি তা জানতে প্রবল আগ্রহী বলেই স্মৃতি বিষয়ক নানান কথাই ডায়েরিতে এসেছে।

নলিনী বাবু বললেন, আপনার ব্যাখ্যায় চমৎকৃত হয়েছি। চলুন ঘরে যাই, আকাশের অবস্থা ভালো না। বৃষ্টি নামবে। আপনার কি মনে আছে প্রথম যখন আপনার সঙ্গে দেখা হয়েছিল তখন প্রবল বর্ষণ হয়েছে।

মনে আছে।

নলিনী বাবু অন্যমনস্ক গলায় বললেন, অন্য জগতেও আপনার সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। তখনও প্রবল বর্ষণ হচ্ছিল। দেখা হয়েছিল উত্তরার সেই বাড়িতেই।

কী দেখেছিলেন বলুন।

নলিনী বাবু বিড়বিড় করে বললেন, আমি জানি সবই আমার অসুস্থ মস্তিষ্কের কল্পনা। তারপরও বলি। আপনার সঙ্গে রাজপুত্রের মতো একটা ছেলে ছিল। বয়স সাত-আট বছর। আমি তাকে বললাম, বাবা তোমার নাম কী? সে বলল, রাশেদ হুমায়ূন। আপনি আমাকে বললেন, আমার এই ছেলেটা জন্মের পর খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ডাক্তাররা বহু কষ্টে তার জীবন রক্ষা করেন।

আমি হতভম্ব হয়ে তাকিয়ে আছি। জন্মের পরপর রাশেদ হুমায়ূনের মৃত্যুর ব্যাপারটা তার জানার কথা না। তারপরও ধরে নিলাম এই তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন।

আমি বললাম, আর কিছু মনে আছে?

নলিনী বাবু বললেন, আপনি আপনার পুত্রকে নিয়ে একটা ছড়া বলেছিলেন। আপনার পুত্র তাতে খুব মজা পাচ্ছিল।

ছড়াটা মনে আছে?

হ্যাঁ।

বলুন শুনি।

নলিনী বাবু ছড়া আবৃত্তি করলেন।

রাশেদ বাবাটিং

দরজা বন্ধ করছিং

আমি বই পড়ছিং

এবং মজা পাচ্ছিং।

আমি দীর্ঘ সময় নলিনী বাবুর দিকে তাকিয়ে রইলাম। কোনোভাবেই এই ছড়া তার জানার কথা না।

হঠাৎ প্রবল আনন্দে আমি অভিভূত হলাম। আমার ছোট্ট বাবা রাশেদ হারিয়ে যায়নি। অন্য একটা জগতে সে তার বাবার সঙ্গেই বাস করছে।*

❑

*নলিনী বাবু আমাকে কিছু না জানিয়ে নিজে নিজেই ক্লিনিকে ভর্তি হন। তাঁর মৃত্যু হয় সেখানেই।

আমি হুমায়ূন আহমেদ, ১৩ নভেম্বর ১৯৪৮ সনে নানাবাড়ি মোহনগঞ্জে (নেত্রকোনা জেলা) জন্মগ্রহণ করেছি। পাসপোর্ট এবং সার্টিফিকেটে লেখা ১০ এপ্রিল ১৯৫০, কেন এই ভুল হয়েছে জানি না।

মা আয়েশা আক্তার। বাবা-মা দু'জনই লেখালেখি করতেন। কিছুদিন আগে মা'র আত্মজৈবনিক একটি বই প্রকাশিত হয়েছে। তিনি মোটামুটি হৈচৈ ফেলে দিয়েছেন।

আমার সংসার শাওন এবং পুত্র নিষাদকে নিয়ে। গায়িকা শাওন প্রতি রাতে ঘুমপাড়ানি গান গেয়ে পুত্রকে ঘুম পাড়াতে চেষ্টা করে। পুত্র ঘুমায় না, আমিই ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের মধ্যেই মনে হয়, জীবনটা খারাপ না তো !